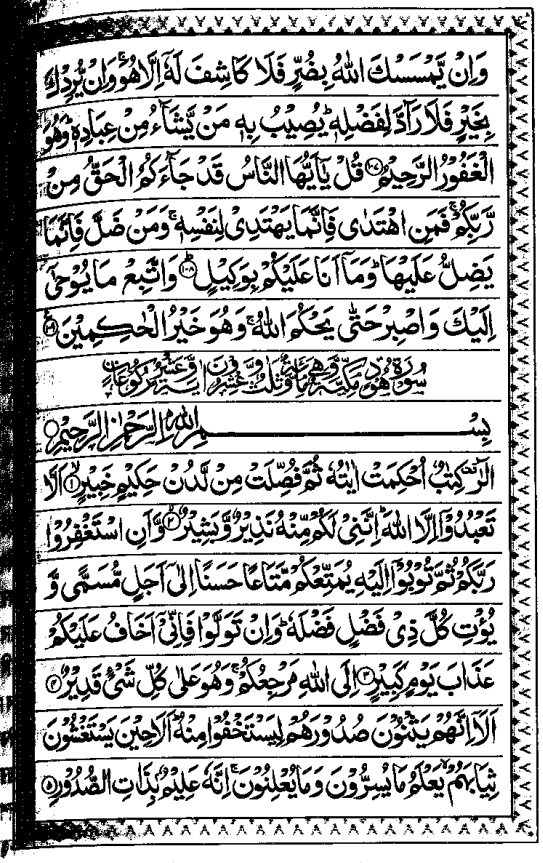

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يُرِدْكَ
بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ
إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَثَلٰثٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَعَشْرُ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ أَلَّا
تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا
رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ
يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾
أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ
ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾

(১০৭) আর আল্লাহ্ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খণ্ডাবার মত তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন; বস্তুতঃ তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু। (১০৮) বলে দাও, হে মানবকুল, সত্য তোমাদের কাছে পৌছে গেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে। এমন যে কেউ পথে আসে সে পথ প্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য। আর যে বিভ্রান্ত ঘুরতে থাকে, সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকবে। অনন্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নই। (১০৯) আর তুমি চল সে অনুযায়ী যেমন নির্দেশ আসে তোমার প্রতি এবং সবর কর, যতক্ষণ না ফয়সালা করেন আল্লাহ্। বস্তুতঃ তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

সূরাহূদ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ঃ ১২৩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

(১) আলিফ, লা-ম, রা; এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত এক মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে। (২) যেন তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাঁরই পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। (৩) আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং অধিক আমলকারীকে বেশী করে দেবেন। আর যদি তোমরা বিমুখ হতে থাক, তবে আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি। (৪) আল্লাহ্র সান্নিধ্যেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৫) জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বক্ষদেশ ঘুরিয়ে দেয় যেন আল্লাহ্র নিকট হতে লুকাতে পারে। শুন, তারা তখন কাপড়ে নিজেদেরকে আচ্ছাদিত করে, তিনি তখনও জানেন যা কিছু তারা চুপিসারে বলে আর প্রকাশ্যভাবে বলে। নিশ্চয় তিনি জানেন যা কিছু অন্তরসমূহে নিহিত রয়েছে।

-"ইউনুস (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এজন্য চলে যাচ্ছিলেন যে, তিনি সম্প্রদায়ের কঠিন বিরোধিতা এবং কুফরীর উপর হঠকারিতা সত্ত্বেও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত রেসালতের আহবান জানাতে থাকার ফলাফল প্রত্যক্ষ করে নিয়েছিলেন।"

বস্তুতঃ তাঁর এ সফর ছিল হিজরত হিসাবেই। অথচ তখনও তিনি হিজরতের অনুমতি লাভ করেননি।

এতে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর প্রতি ভর্ৎসনা আসার কারণ রেসালত ও দাওয়াতের দায়িত্বে শৈথিল্য প্রদর্শন ছিল না; বরং অনুমতির পূর্বে হিজরত করাই ছিল ভর্ৎসনার কারণ। উল্লেখিত সমকালীন তফসীরকারকে কোন কোন ওলামা তাঁর এই ভুলের ব্যাপারে অবহিত করলে তিনি সূরা-সাফ্ফাতের তফসীরে স্বীয় মতবাদের সমর্থনে অনেক তফসীরবিদের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ প্রমুখের ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহ ছাড়া অন্য কোনটির দ্বারাই তাঁর এ মতবাদের সমর্থন প্রমাণিত হয় না যে, হযরত ইউনুস (আঃ)-এর দ্বারা (মা'আযাল্লাহ্) রেসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছিল।

তাছাড়া জ্ঞানবান বিজ্ঞ লোকদের একথা অজানা নেই যে, তফসীরবিদগণ নিজেদের তফসীরে এমনসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহও উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, যেগুলোর ব্যাপারে তাদের সবাই একমত যে, এসব রেওয়ায়েত প্রামাণ্য কিংবা গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তের কোন হুকুমকে এগুলোর উপর নির্ভরশীল করা যায় না। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত মুসলিম তফসীরবিদদের গ্রন্থেই থাক বা ইউনুস (আঃ)-এর সহীফাতেই থাক, শুধু এসবের উপর নির্ভর করেই হযরত ইউনুস (আঃ)-এর উপর এহেন মহা অপবাদ আরোপ করা যেতে পারে না যে, তাঁর দ্বারা রেসালতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়েছে। ইসলামের কোন তফসীরকার এহেন কোন মত গ্রহণও করেননি।

সূরা হূদ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হূদ ঐসব সূরার অন্যতম যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আপতিত খোদায়ী গজব ও বিভিন্ন প্রকার কঠিন আযাবের এবং পরে কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা বিশেষ বর্ণনারীতির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একদিন হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর কিছু দাড়ি-মোবারক পাকা দেখে বিচলিত হয়ে যখন জিজ্ঞেস করলেন-"ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ); আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন।" তখন রসূলে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছিলেন, "হাঁ, সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।" তখন কোন কোন রেওয়ায়েতে সূরা হূদের সাথে সূরা ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসা'আলুন এবং সূরা তাকবীরের নামও উল্লেখ করা হয়েছে।-(আল-হাকেম ও তিরমিযী শরীফ) উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত সূরাগুলিতে বর্ণিত বিষয়বস্তু অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ হওয়ার কারণে এসব সূরা নাযিল হওয়ার পর রসূলে পাক (সাঃ)-এর পবিত্র চেহারায় বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা দেয়।

অত্র সূরার প্রথম আয়াত "আলিফ লা'ম রা" বলে শুরু করা হয়েছে। এগুলো সে সমস্ত বর্ণের অন্তর্ভুক্ত যার সঠিক মর্ম একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর

রসূল (সাঃ)-এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য। অন্য কাউকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি; বরং এ ব্যাপারে চিন্তা করতেও বারণ করা হয়েছে।

অতঃপর কোরআন মজীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। محكم শব্দ احكام হতে গৃহীত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে কোন বাক্যকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করা যার মধ্যে শব্দগত বা ভাবগত কোন বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। সেমতে আয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহকে এমনভাবে তৈরী করেছেন যাতে শাব্দিক অথবা ভাবগত দিক দিয়ে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি, অস্পষ্টতা বা অসারতার সম্ভাবনা নেই।—(তফসীরে-কুরতুবী)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন এখানে محكم শব্দ منسوخ-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেমতে আয়াতের মর্ম হবে—আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকের আয়াতসমূহকে সামগ্রিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, অপরিবর্তিতরূপে তৈরী করেছেন। তওরাত, ইঞ্জীল, ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাসমূহ পবিত্র কোরআন নাযিলের ফলে যেভাবে 'মনসূখ'বা রহিত হয়েছে কোরআন পাক নাযিল হওয়ার পর যেহেতু নবীর আগমন এবং ওহীর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব আর রহিত হবে না।—(কুরতুবী) তবে কোরআনের এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াত রহিত হওয়া এর পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য ১ম আয়াতেই ثُمَّ فُصِّلَتْ অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে বলে কোরআন পাকের আরেকটি মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। تفصيل শব্দের আভিধানিক অর্থ দু'টি বস্তুর মাঝে পার্থক্য ও ব্যবধান করা। সে জন্যেই সাধারণ গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন বিষয়বস্তু فصل، فصل শিরোনামে আলোচনা করা হয়। সে হিসাবে অত্র আয়াতের মর্ম হবে, আকায়েদ, এবাদত, লেন-দেন আচার-ব্যবহার ও নীতি-নৈতিকতার বিষয়বস্তুগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর আরেক অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তো পূর্ণ কোরআন মজীদ একসাথে লওহে মাহফূযে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারপর স্থান-কাল-পাত্র, পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর স্মরণ রাখা, মর্ম অনুধাবন করা এবং ক্রমানুয়ে তদনুযায়ী আমল করা সহজ হয়।

অতঃপর বলা হয়েছে مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ অর্থাৎ, এসব আয়াত এমন এক মহান সত্তার পক্ষ হতে আগত হয়েছে, যিনি মহা প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ, যার প্রতিটি কাজে বহু তাৎপর্য ও হেকমত বিদ্যমান—যা মানুষ উপলব্ধি করতে অক্ষম। তিনি সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু ভূত-ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি যাবতীয় বিধি-নিষেধ নাযিল করেন। মানুষ যতবড় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান ও দূরদর্শী হোক না কেন, তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা এক নির্ধারিত সীমারেখার গন্ডিতে আবদ্ধ। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ভিত্তিতে তাদের অভিজ্ঞতা গড়ে উঠে। ভবিষ্যৎকালে অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক সময়ই তা ব্যর্থ ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার এলম ও হেকমত কখনো ভুল হবার নয়।

দ্বিতীয় আয়াতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ, তওহীদের উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহের বর্ণনা আরম্ভ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ অর্থাৎ, "একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করবে না।" আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ্ তা আলা ব্যতীত অন্য কারও এবাদত-উপাসনা করবে না।

অতঃপর এরশাদ করেছেন اِنَّنِىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ 'নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। এ আয়াতে বিশ্বনবী (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তিনি সারা বিশ্ববাসীকে যেন জানিয়ে দেন যে, আমি আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী। অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ ও রসুলের অবাধ্য ও বিরুদ্ধাচরণকারী এবং নিজেদের অবৈধ কামনা-বাসনার অনুসারী, তাদেরকে আল্লাহ্র ভীতি প্রদর্শন করছি। অপরিদকে অনুগত, বাধ্যগত লোকদের দো-জাহানের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আখেরাতে অফুরন্ত নেয়ামতের সুসংবাদ দিচ্ছি।

نَذِيْرٌ শব্দের অর্থ করা হয়, "ভীতি প্রদর্শনকারী।" কিন্তু এ শব্দটি ভীতি প্রদর্শনকারী শত্রু কিংবা হিংস্রজন্তু বা অন্য কোন অনিষ্টকারীর জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং এমন ব্যক্তিকে "নাযীর" বলা হয় যিনি স্বীয় প্রিয়পাত্রগণকে সস্নেহে এমনসব বস্তু বা কার্য হতে বিরত রাখেন ও ভয় দেখান, যা তাদের জন্য দুনিয়া, আখেরাত অথবা উভয় কালেই ক্ষতিকারক।

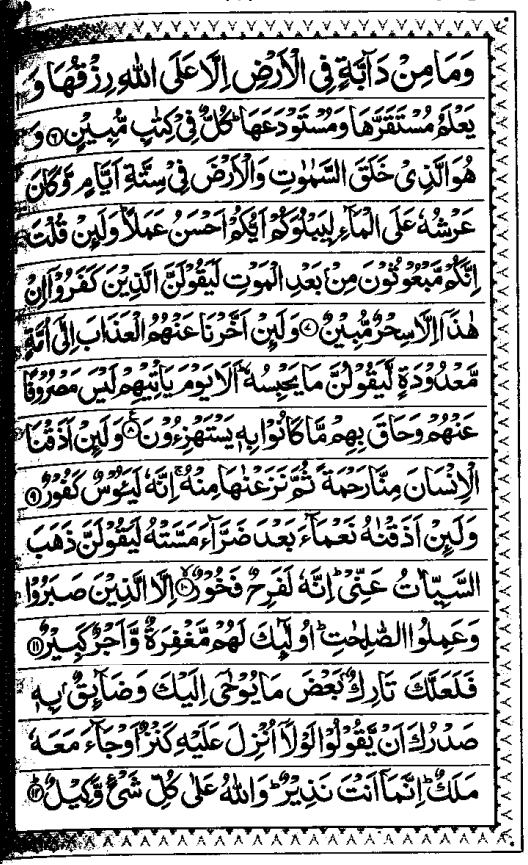

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَ
يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٦ وَ
هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّكَانَ
عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ
إِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِنْ
هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلٰٓى أُمَّةٍ
مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا
عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٨ وَلَئِنْ أَذَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ إِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ ۝٩
وَلَئِنْ أَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ
السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ إِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ۝١٠ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝١١
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهٖ
صَدْرُكَ أَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهٗ
مَلَكٌ إِنَّمَآ أَنْتَ نَذِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝١٢

(৬) আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিয়েছেন, তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে। (৭) তিনিই আসমান ও যমীন ছয় দিনে তৈরী করেছেন, তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন যে, "নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত উঠানো হবে, তখন কাফেররা অবশ্য বলে এটা তো স্পষ্ট যাদু। (৮) আর যদি আমি এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তাদের আযাব স্থগিত রাখি, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে কোন জিনিসে আযাব ঠেকিয়ে রাখছে? শুনে রাখ, যেদিন তাদের উপর আযাব এসে পড়বে, সেদিন কিন্তু তা ফিরে যাওয়ার নয়; তারা যে ব্যাপারে উপহাস করত তাই তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। (৯) আর অবশ্যই যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করতে দেই, অতঃপর তা তার থেকে ছিনিয়ে নেই; তাহলে সে হতাশ ও কৃতঘ্ন হয়। (১০) আর যদি তার উপর আপতিত দুঃখ-কষ্টের পরে তাকে সুখভোগ করতে দেই, তবে সে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল দূর হয়ে গেছে, আর সে আনন্দে আত্মহারা হয়, অহঙ্কারে উদ্ধত হয়ে পড়ে। (১১) তবে যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং সৎকার্য করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে। (১২) আর সম্ভবতঃ ঐসব আহকাম যা ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট পাঠানো হয়, তার কিছু অংশ বর্জন করবে? এবং এতে মন ছোট করে বসবে? অদের এ কথায় যে, তাঁর উপর কোন ধন-ভান্ডার কেন অবতীর্ণ হয়নি? অথবা তাঁর সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন? তুমিতো শুধু সতর্ককারী মাত্র; আর সব কিছুরই দায়িত্বভার তো আল্লাহই নিয়েছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

دَآبَّةٍ (দাব্বাতুন) এমনসব প্রাণীকে বলে যা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে। পক্ষীকুলও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, খাদ্য গ্রহণের জন্য তারা ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করে থাকে এবং তাদের বাসস্থান ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন হয়ে থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীসমূহও পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল। কেননা, সাগর-মহাসাগরের তলদেশেও মাটির অস্তিত্ব রয়েছে। মোটকথা, সমুদয় প্রাণীকুলের রিযিকের দায়িত্বই তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন এবং একথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যাদ্দ্বারা দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা যায়। এরশাদ করেছেন عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا 'তাদের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তাআলার উপর এহেন গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার মত কোন ব্যক্তি বা শক্তি নেই, বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে গ্রহণ করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। আর এক পরম সত্য, দাতা ও সর্বশক্তিমান সত্তার ওয়াদা যাতে নড়চড় হওয়ার অবকাশ নেই। সুতরাং নিশ্চয়তা বিধান করণার্থ এখানে على শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা ফরয বা অবশ্যকরণীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অথচ আল্লাহ্র উপর কোন কাজ ফরয বা ওয়াজিব হতে পারে না, তিনি কারো হুকুমের তোয়াক্কা করেন না।

رزق রিযিকের আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু যা কোন প্রাণী আহার্যরূপে গ্রহণ করে, যার দ্বারা সে দৈহিক শক্তি সঞ্চয়, প্রবৃদ্ধি সাধন এবং জীবন রক্ষা করে থাকে। রিযিকের জন্য মালিকানা স্বত্ব শর্ত নয়। সকল জীব-জন্তু রিযিক ভোগ করে থাকে কিন্তু তারা তার মালিক হয় না। কারণ, মালিক হওয়ার যোগ্যতাই ওদের নেই। অনুরূপভাবে ছোট শিশুরাও মালিক নয়, কিন্তু ওদের রিযিক অব্যাহতভাবে তাদের কাছে পৌঁছতে থাকে। রিযিকের এহেন ব্যাপক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে ওলামায়ে কেরাম বলেন, রিযিক হালালও হতে পারে, হারামও হতে পারে। যখন কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে অন্যের মাল হস্তগত ও উপভোগ করে, তখন উক্ত বস্তু তার রিযিক হওয়া সাব্যস্ত হয়, তবে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করার কারণে তা তার জন্য হারাম হয়েছে। যদি সে লোভের বশবর্তী হয়ে অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করত, তাহলে তার জন্য নির্ধারিত রিযিক বৈধপন্থায়ই তার নিকট পৌঁছে যেত।

রিযিক সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ঃ এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রতিটি প্রাণীর জিবিকার দায়িত্ব যেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা খোদ গ্রহণ করেছেন, কাজেই অনাহারে কারো মৃত্যুবরণ করার কথাই নয়। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, অনেক প্রাণী ও মানুষ খাদ্যের অভাবে, অনাহারে ক্ষুধা-পিপাসায় মারা যায়, এর রহস্য কি? ওলামায়ে কেরাম এ প্রশ্নের বিভিন্নভাবে জবাব দিয়েছেন।

তন্মধ্যে একটি জবাব হচ্ছে, এখানে রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণের অর্থ হবে আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন। আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া মাত্র তাকে মৃত্যুবরণ করে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিদায় নিতে হবে। সাধারণত বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির কারণে মৃত্যু হলেও কখনো কখনো অগ্নিদগ্ধ হওয়া, সলিল সমাধি লাভ করা, আঘাত বা দুর্ঘটনায় পতিত হওয়াও এর কারণ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে রিযিক বন্ধ করে দেয়ার কারণে অনাহারও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কাজেই, আমরা যাদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে দেখি, আসলে তাদের রিযিক ও আয়ু শেষ হয়ে গেছে, অতঃপর

রোগ-ব্যাধি বা দুর্ঘটনায় তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি না ঘটিয়ে বরং রিযিক সরবরাহ বন্ধ হওয়ার কারণে অনাহার ও ক্ষুধা-পিপাসায় তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।

ইমাম কুরতুবী (রঃ) অত্র আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবু মুসা (রাঃ) ও হযরত আবু মালেক (রাঃ) প্রমুখ আশআরী গোত্রের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে, তারা ইয়ামন হতে হিজরত করে মদীনা শরীফ পৌঁছলেন। তাঁদের সাথে পাথেয় স্বরূপ আহার্য পানীয় যা ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে গেলে তাঁরা নিজেদের পক্ষ হতে একজন মুখপাত্র হযরত (সাঃ)-এর সমীপে প্রেরণ করলেন যেন রসূলে করীম (সাঃ) তাদের জন্য কোন আহার্যের সু-ব্যবস্থা করেন। উক্ত প্রতিনিধি যখন রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর গৃহদ্বারে হাযির হলেন, তখন গৃহাভ্যন্তর হতে রসূলে পাক (সাঃ)-এর কোরআন তেলাওয়াতের সুমধুর ধ্বনি ভেসে এল وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্ গ্রহণ করেননি। সাহাবী অত্র আয়াত শ্রবণ করে মনে করলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং যখন যাবতীয় প্রাণীকুলের রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমরা আশআরী গোত্রের লোকেরা আল্লাহ্ তাআলার নিকট নিশ্চয় অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট নই, অতএব তিনি অবশ্যই আমাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। এ ধারণা করে তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিজেদের অসুবিধার কথা না বলেই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ফিরে গিয়ে স্বীয় সাথীদের বললেন— "শুভ-সংবাদ, তোমাদের জন্য আল্লাহ্র সাহায্য আসছে।" তাঁরা এ কথার অর্থ বুঝলেন যে, তাঁদের মুখপাত্র নিজেদের দুরবস্থার কথা রসূলে পাক (সাঃ)-কে অবহিত করার পর তিনি তাঁদের আহার্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁরা নিশ্চত মনে বসে রইলেন। তাঁরা উপবিষ্টই ছিলেন, এমন সময় দুই ব্যক্তি গোশত-রুটিপূর্ণ একটি قصعة অর্থাৎ, বড় খাঞ্চা বহন করে উপস্থিত হয়ে আশআরীদের দান করল। অতঃপর দেখা গেল আশআরী গোত্রের লোকদের আহার করার পরও প্রচুর রুটি-গোশত রয়ে গেল। তখন তাঁরা পরামর্শ করে অবশিষ্ট খানা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সমীপে প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন, যেন তিনি প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করতে পারেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের দুই ব্যক্তির মাধ্যমে তা রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন।

তারা খাঞ্চা নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন- "ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ), আপনার প্রেরিত রুটি-গোশ্ত অত্যন্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয়েছে।" তদুত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "আমি তো কোন খাদ্য প্রেরণ করিনি!"

তখন তাঁরা পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, আমাদের অসুবিধার কথা আপনার কাছে ব্যক্ত করার জন্য অমুক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি ফিরে গিয়ে একথা বলেছিলেন। ফলে আমরা মনে করেছি যে, আপনিই খানা প্রেরণ করেছেন। এতদশ্রবণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন— "আমি নই বরং ঐ পবিত্র সত্তা প্রেরণ করেছেন যিনি সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।"

আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলে করীম (সাঃ)-এর রেসালতের সত্যতা এবং এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদের জবাব দেয়া হয়েছে। ৯ম থেকে তিন আয়াতে মানুষের একটি স্বভাবজাত বদভ্যাসের বর্ণনা এবং উহা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৯ম ও ১০ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ জন্মগতভাবে চঞ্চল প্রকৃতির ও ক্ষিপ্রতাবাদী। এতদসঙ্গে মানুষের বর্তমান নিয়ে বিভোর হয়ে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ করেছেন, আমি মানুষকে আমার কোন নেয়ামতের স্বাদ-আস্বাদন করানোর পর যদি তা ছিনিয়ে নেই, তবে তারা একেবারে হিম্মত-হারা, হতাশ ও না-শোকর হয়ে যায়। আর তার উপর দুঃখ-দুর্দশা আপতিত হওয়ার পর, যদি তা দূরীভূত করে সুখ-শান্তি দান করি, তাহলে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল চিরতরে দূরীভূত হয়ে গেছে।

সারকথা এই যে, মানুষ স্বভাবতঃ ক্ষিপ্রতাবাদী বর্তমান অবস্থাকেই তারা সর্বস্ব মনে করে থাক। অতীত ও ভবিষ্যতের অবস্থা এবং ইতিবৃত্ত স্মরণ রেখে এবং চিন্তা করে শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা অভ্যস্ত নয়। কাজেই, সুখ-সমৃদ্ধির পর দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়া মাত্র অতীত নেয়ামতরাজির প্রতি নিমকহারামী করে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যে মহান সত্তা প্রথমে সুখ-সচ্ছলতা দান করেছিলেন, তিনি যে আবারও তা দিতে পারেন সে কথা তারা খেয়ালই করে না। অনুরূপভাবে দুখ-দৈন্যের পরে যদি সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে, তখন পূর্বাবস্থা স্মরণ করে আল্লাহ্ তাআলার শোকর আদায় করার পরিবর্তে হঠকারিতা ও অহংকার করতে থাকে। অতীতকে বিস্মৃত হয়ে তারা মনে করতে থাকে যে, এসব সুখ-সম্পদ আমারই যোগ্যতার পুরস্কার এবং অবশ্যম্ভাবী প্রাপ্য। এটা কখনো আমার হাতছাড়া হবে না। আত্মভোলা মানুষ এ কথা চিন্তা করে না যে, পূর্ববর্তী দুঃখ-দুর্দশা যেমন স্থায়ী হয়নি, তদ্রূপ বর্তমান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চিরস্থায়ী নাও হতে পারে।

১১ তম আয়াতে এমনি ইনসানে-কামেল বা সত্যিকার মানুষকে সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা হতে পৃথক করার জন্য এরশাদ করেছেন إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ অর্থাৎ, সাধারণ মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে এসব ব্যক্তি যাদের মধ্যে দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে। একটি হচ্ছে ধৈর্য ও সহনশীলতা, দ্বিতীয়টি সৎকর্মশীলতা।

صبر সবর শব্দটি বাংলা ও উর্দুর চেয়ে আরবী ভাষায় অনেক ব্যাপকতর অর্থ ব্যবহৃত হয়। সবরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাধা দেয়া, বন্ধন করা। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় অন্যান্য কার্য হতে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করাকে 'সবর' বলে। সুতরাং শরীয়তের পরিপন্থী যাবতীয় পাপকার্য হতে প্রবৃত্তিকে দমন করা যেমন সবরের অন্তর্ভুক্ত, তদ্রূপ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব ইত্যাদি নেক কাজের জন্য প্রবৃত্তিকে বাধ্য করাও সবরের শামিল। সারকথা, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও রোজ কেয়ামতের জবাবদিহির ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ্ ও রসূলের অপছন্দনীয় কার্যকলাপ হতে দূরে থাকে এবং সন্তুষ্টিজনক কার্যে মশগুল থাকে, তারাই পূর্ণ ঈমানদার ও সত্যিকার মানুষ নামের যোগ্য। অত্র আয়াতেরই শেষ বাক্যে ধৈর্য ধারণকারী, সৎকর্মশীল, পূর্ণ ঈমানদারগণের প্রতিদান ও পুরস্কারের কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে- أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ অর্থাৎ, তাদের জন্য আল্লাহ্র ওয়াদা রয়েছে যে, তাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে এবং তাদের সৎকার্যসমূহের বিরাট প্রতিদান দেয়া হবে।

এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, পার্থিব সুখ-দুঃখ উভয়কে আল্লাহ্ তাআলা أَذَقْنَا "স্বাদ আস্বাদন করাই" বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, আসল সুখ-দুঃখ পরকালে হবে। পৃথিবীতে পুরোপুরি সুখ বা দুঃখ নেই। যা

...পক্ষে স্বাদ গ্রহণের জন্য নমুনাস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ সুখ-দুঃখ দেয়া ...যেন, আখেরাতের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে ...। সুতরাং পার্থিব সুখ-শান্তিতে আনন্দে আত্মহারা হওয়া যেমন ...ী, তদ্রূপ পার্থিব দুঃখ-দুর্দশাও অত্যধিক বিমর্ষ হওয়ার বিষয় নয়। ... দুনিয়াকে আধুনিক পরিভাষা অনুসারে আখেরাতের একটা ...স্বরূপ বলা যেতে পারে। যেখানে আখেরাতের সুখ-দুঃখের নুমনা ...নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

...তম আয়াত এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তা ...মক্কার মুশরিকরা মহানবী (সাঃ) সমীপে কতিপয় আবদার পেশ ...ছিল। প্রথমতঃ তারা বলল, এতে আমাদের দেব-দেবীকে নিন্দা করা ...হয়। তাই আমরা এর প্রতি ঈমান আনতে পারছি না। অতএব, আপনি ...অন্য কোরআন নিয়ে আসুন অথবা এর মধ্যে পরিবর্তন ও সংশোধন ...। ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ আপনি অন্য কোরাঅন নিয়ে আসুন ...বা এগুলো পরিবর্তন করুন।"—(তফসীরেবগবী ও তফসীরে ...হারী)।

দ্বিতীয়তঃ তারা আরো বলেছিল যে, "আমরা আপনার নবুওয়তের ... তখন বিশ্বাস স্থাপন করব, যখন দেখব যে, দুনিয়ার ...রাজা-বাদশাহদের মত আপনার আয়ত্তে কোন ধন-ভান্ডার রয়েছে এবং ...যেখান থেকে অপনি সবাইকে দান করেছেন। অথবা, আসমান হতে কোন ...ফেরেশতা অবতরণ করে আপনার সাথে সাথে থাকবেন এবং আপনার ...কথা সমর্থন করে বলবে যে, ইনি সত্যিই আল্লাহ্‌র রসূল।"

তাদের এহেন অবাস্তব ও অযৌক্তিক আবদার শুনে রসূলে করীম (সাঃ) মনঃক্ষুণ্ন হলেন। কারণ, তাদের অযৌক্তিক আবদার পূরণ করা যেমন তাঁর এখতিয়ার বহির্ভূত ছিল, তদ্রূপ তাদেরকে কুফরী ও শেরকের অবস্থায় ছেড়ে দেয়াও অসহনীয় ছিল, তাদের হেদায়েতের চিন্তা-ফিকির অন্তর হতে দুর করাও সম্ভবপর ছিল না। কেননা, রাহমাতুল-লিল আলামীন বা সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমতস্বরূপ তিনি অবতরণ করেছিলেন।'

বস্তুতঃ তাদের আবদার ছিল নিরেট মূর্খতা ও চরম অজ্ঞতা-প্রসূত। কেননা, সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অসার মূর্তিপূজা ও অন্যান্য নিন্দনীয় কার্য-কলাপের সমালোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়তঃ নবুওয়তকে তারা বাদশাহীর সাথে তুলনা করেছিল। আসলে ধন-ভান্ডারের সাথে নবুওয়তের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। অপরদিকে আল্লাহ্‌ তাআলারও এমন কোন রীতি নেই যে, তিনি বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে মানুষকে দায়ে ঠেকিয়ে ঈমান আনতে বাধ্য করবেন। তাই যদি হতো, তবে নিখিল সৃষ্টিজগত তাঁর অপার কুদরতের আওতায়ই রয়েছে। কার সাধ্য ছিল যে, তাঁর অপছন্দনীয় কোন কাজ করবে বা চিন্তাধারা পোষণ করবে? কিন্তু তাঁর অফুরন্ত হেকমতের তাগিদে ইহ-জগতকে পরীক্ষাক্ষেত্র সাব্যস্ত করেছেন। এখানে সৎকার্য সম্পাদন অথবা, অন্যায়-অসত্য থেকে বিরত রাখার জন্য বৈষয়িক দিক থেকে কাউকে বাধ্য করা হয় না।

তবে যুগে যুগে পয়গম্বর প্রেরণ ও আসমানী কিতাব নাযিল করে ভাল-মন্দের পার্থক্য এবং তার প্রতিফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। সৎকার্য করা ও অসৎকার্য থেকে দূরে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর মু'জেযাস্বরূপ সাথে সাথে যদি কোন ফেরেশতা থাকতেন, তবে যখনই কেউ তাঁকে অমান্য করত, তৎক্ষণাৎ গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হত। ফলে তা দায়ে ঠেকে ঈমান আনার পর্যায়ভুক্ত হত। তাছাড়া ফেরেশতার সাক্ষ্যদানের পর ঈমান আনা হলে তা ঈমান বিল-গায়ব বা গায়বের প্রতি ঈমান হত না। অথচ ঈমান বিল-গায়বই হচ্ছে ঈমানের মূল প্রাণশক্তি। আর ঈমান না আনার এখতিয়ারও থাকত না। অথচ এই এখতিয়ারের উপরই যাবতীয় আমলের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমীপে তাদের এহেন অর্থহীন আবদার প্রমাণ করে, তারা নবী ও রসূলের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ ও জাহেল ছিল। তারা আল্লাহ্‌ তাআলা ও রসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখে না; বরং আল্লাহ্‌র ন্যায় রসূলকেও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। তাই রসূলের কাছে তারা এমন আবদার করেছে যা একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কেউ পূরণ করতে পারে না।

যাহোক, রসূলে করীম (সাঃ) তাদের এহেন অবান্তর আবদারে অত্যন্ত দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দান ও মুশরেকদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য অত্র আয়াত অবতীর্ণ হল।

যাতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, আপনি কি তাদের কথায় হতোদ্যম হয়ে আল্লাহ্‌র প্রেরিত কোরআন পাকের কোন কোন আয়াত প্রচার করা ছেড়ে দেবেন, যার মধ্যে মূর্তির অসারতা ও অক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে বলে মুশরেকরা ঐ সব আয়াত অপছন্দ করছে? এখানে لعلك শব্দ এজন্য প্রয়োগ করা হয়নি যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কোন কোন আয়াত বাদ দেবেন বলে ধারণা করার অবকাশ ছিল। বরং এখানে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, মুশরেকদের মনোরঞ্জনের খাতিরে রসূলে পাক (সাঃ) কোরআন করীমের কোন আয়াত গোপন রাখতে পারেন না। কারণ, তিনি তো আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে نذير ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরিত হয়েছেন। সর্ব কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই গ্রহণ করেছেন। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখনই নবীর মাধ্যমে মু'জেযা প্রদর্শন করেন। অতএব, তাদের অন্যায় আবদারে আপনার মনঃক্ষুণ্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

কাফের ও মুশরেকরা শুধু ভীতি প্রদর্শনের যোগ্য হওয়ার কারণে এখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে نذير নাযীর বলা হয়েছে। নতুবা তিনি একদিকে যেমন نذير (ভীতি প্রদর্শক) ছিলেন, অপরদিকে সৎকর্মশীলদের জন্য তদ্রূপ بشير সুসংবাদাতাও ছিলেন। অধিকন্তু 'নাযীর' এমন ব্যক্তিকে বলে যিনি স্নেহ-মমতার ভিত্তিতে স্বীয় প্রিয়জনকে অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু হতে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করেন এবং রক্ষা করার চেষ্টা করেন। অতএব, নাযীর শব্দের মধ্যে 'বশীর'-এর মর্মও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَ
ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾
فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ
إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ
زِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا
صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ
بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ
إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ
الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ
مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَ
يَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾

(১৩) তারা কি বলে? কোরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে। (১৪) অতঃপর তারা যদি তোমাদের কথা পূরণ করতে অপারগ হয়; তবে জেনে রাখ, এটি আল্লাহ্র এলম দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছে; আরো একীন করে নাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। অতএব, এখন কি তোমরা আত্মসমর্পণ করবে? (১৫) যে ব্যক্তি পার্থিবজীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। (১৬) এরাই হল সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল। (১৭) আচ্ছা বল তো, যে ব্যক্তি তার প্রভুর সুস্পষ্ট পথে রয়েছে, আর সাথে সাথে আল্লাহ্র তরফ থেকে একটি সাক্ষীও বর্তমান রয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী মূসা (আঃ)–এর কিতাবও সাক্ষী যা ছিল পথনির্দেশক ও রহমত স্বরূপ, (তিনি কি অন্যান্যের সমান)? অতএব তাঁরা কোরআনের প্রতি ঈমান আনেন। আর ঐসব দলগুলির যে কেউ তা অস্বীকার করে, দোযখই হবে তার ঠিকানা। অতএব, আপনি তাতে কোন সন্দেহে থাকবেন না। নিঃসন্দেহে তা আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে ধ্রুব সত্য; তথাপি অনেকেই তা বিশ্বাস করে না। (১৮) আর তাদের চেয়ে বড় যালেম কে হতে পারে, যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করে। এসব লোককে তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত সম্মুখীন করা হবে আর সাক্ষিগণ বলতে থাকবে, এরাই ঐসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখ, যালেমদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত রয়েছে। (১৯) যারা আল্লাহ্র পথে বাধা দেয়, আর তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায়, এরাই আখেরাতকে অস্বীকার করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে মুশরেকদের পক্ষ হতে বিশেষ ধরনের মু'জেযা দাবী করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হযরত (সাঃ)–এর মু'জেযা পাক–কোরআন তোমাদের সম্মুখে রয়েছে, যার অলৌকিকত্ব তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমরা যদি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ মু'জেযার দাবী করে থাক, তাহলে কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের দাবী পূরণ করা হয়েছে। সুতরাং নতুন কোন মু'জেযা দাবী করার কোন অধিকার তোমাদের নেই। আর যদি ধৃষ্টতার কারণে তোমরা মু'জেযার দাবী করে থাক, তাহলে তোমাদের মত হঠকারী লোকেরা মু'জেযা দেখার পর ঈমান আনয়ন করবে এমন আশাও করা যায় না। সারকথা, কোরআন করীম যে এক স্পষ্ট ও স্থায়ী মু'জেযা, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ব্যাপারে কাফের ও মুশরেকরা যেসব অমূলক সন্দেহ–সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল পরবর্তী দুই আয়াতে তার জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে যে, তারা কি বলতে চায় যে, কোরআন মজীদ আল্লাহ্র কালাম নয়; বরং হযরত (সাঃ) স্বয়ং তা রচনা করেছেন? যদি তোমরা তাই মনে করে থাক যে, এরূপ বিস্ময়কর কালাম নবীয়ে–উম্মী (সাঃ) নিজে রচনা করেছেন, তাহলে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে দেখাও। আর একই ব্যক্তি দশটি সূরা তৈরী করতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। বরং সারা দুনিয়ার পন্ডিত, সাহিত্যিক, মানুষ ও জিন, তথা দেব–দেবী সবাই মিলেই তা রচনা করে আন। কিন্তু তারা যখন দশটি সূরাও তৈরী করতে পারছে না, তাই আপনি বলুন যে, এই কোরআন যদি কোন মানুষের রচিত কালাম হতো, তাহলে অন্য মানুষেরাও অনুরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম হত। সকলের অপারগ হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, এই কোরআন আল্লাহ্ পাকের এলম ও কুদরতে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত। এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ হ্রাস–বৃদ্ধি করারও অবকাশ নেই।

অত্র আয়াতে দশটি সূরা তৈরী করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। কিন্তু তা করতে যখন তারা অপারগ হল, তখন তাদের অক্ষমতা আরো প্রকটভাবে প্রমাণ করার জন্য কোরআন করীমের সূরা বাক্বারার আয়াতে মাত্র একটি সূরা তৈরী করার চ্যালেঞ্জ করা অর্থাৎ, তোমরা পবিত্র কোরআনকে যদি মানুষের তৈরী কালাম বলে মনে করে থাক, তাহলে তোমরা বেশী নয় অনুরূপ একটি সূরা তৈরী করে আন। কিন্তু তাদের জন্য এতটা সহজ করে দেয়া সত্ত্বেও কোরআন পাকের এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে সক্ষম হল না। অতএব, কোরআন মজীদ আল্লাহ্র কালাম ও স্থায়ী মু'জেযা হওয়া সন্দেহাতীত প্রমাণিত হল। তাই পরিশেষে বলা হয়েছে— فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ অর্থাৎ, এখনও কি তোমরা মুসলমান ও আনুগত্যপরায়ণ হবে, নাকি সে গাফলতিতেই মজে থাকবে?

ইসলাম বিরোধীদের যখন আযাবের ভয় দেখানো হতো, তখন তারা নিজেদের দান–খয়রাত, জনসেবা ও জনহিতকর কার্যাবলীকে সাফাইরূপে তুলে ধরত। তারা বলত যে, এতসব সৎকার্য করা সত্ত্বেও আমাদের শাস্তি হবে কেন? আজকাল পান্ডিত্যের দাবীদার অনেক অজ্ঞ মুসলমানকেও এহেন সন্দেহে পতিত দেখা যায়। বাহ্যিকদৃষ্টিতে যেসব অমুসলমান সৎচরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ হয় এবং কোন রাস্তা, পুল, হাসপাতাল, পানি সরবরাহ ইত্যাদি কোন জনকল্যাণকর কাজ করে, তাদেরকে মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। ১৫তম এ আয়াতে সে মনোভাবেরই জবাব দেয়া হয়েছে।

জবাবের সারকথা এই যে, প্রতিটি সৎকার্য গ্রহণযোগ্য ও পারলৌকিক কারণ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে , সেটা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার লাভের জন্য করতে হবে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য তা আকরাম (সাঃ)-এর তরীকা মোতাবেক হতে হবে। যে ব্যক্তি ও তদীয় রসূলের প্রতি ঈমানই রাখে না, তার যাবতীয় কার্যকলাপ মহিমা, নীতি-নৈতিকতা প্রাণহীন দেহের ন্যায়। যার বাহ্যিক আকৃতি সুন্দর হলেও আখেরাতে তার কানাকড়িরও মূল্য নেই। তবে দৃশ্যতঃ যেহেতু পুণ্যকার্য ছিল এবং তা দ্বারা বহু লোক উপকৃত হয়েছে, তাই আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু এহেন তথাকথিত সৎকার্যকে সম্পূর্ণ বিফল ও বিনষ্ট করেন না' বরং এসব লোকের যা মুখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য ছিল যেমন তার খ্যাতি ও সম্মান বৃদ্ধি হবে, লোকে তাকে দানশীল, মহান ব্যক্তিরূপে স্মরণ করবে, নেতারূপে তাকে বরণ করবে ইত্যাদি আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহ ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে ইহজীবনেই দান করেন। অপরদিকে আখেরাতে মুক্তিলাভ করা যেহেতু তাদের কাম্য ছিল না এবং তাদের হীন সৎকার্য আখেরাতের অপূর্ব ও অনন্ত নেয়ামতসমূহের মূল্য পাওয়ার যোগ্য ছিল না, কাজেই আখেরাতে তার কোন প্রতিদানও লাভ করবে না। বরং নিজেদের কুফরী, শেরেকী ও গোনাহের কারণে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল তাদের জ্বলতে হবে। এই হল ১৫ তম আয়াতের সংক্ষিপ্ত সার। এবার অত্র আয়াতের শব্দবিন্যাস লক্ষ্য করুন।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে যে, "আখেরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছু নেই।" এতেকরে বোঝা যায় যে, অত্র আয়াত কাফেরদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কেননা, একজন মুসলমান যত বড় পাপীই হোক না কেন, তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে দোযখ থেকে মুক্তিলাভ করে বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং আরাম-আয়েশ ও নেয়ামত লাভ করবে। এজন্য যাহ্হাক প্রমুখ মুফাসসিরগণের মতে অত্র আয়াত শুধু কাফেরদের উপর প্রযোজ্য।

কোন কোন মুফাসসিরের মতে অত্র আয়াতে ঐসব মুসলমানদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে—যারা সৎকার্যের বিনিময়ে শুধু পার্থিবজীবনে সুখ-শান্তি, যশ-খ্যাতি প্রত্যাশা করে। লোক দেখানো মনোভাব নিয়ে কাজ করে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের মর্ম হবে এই যে, তারা নিজেদের পাপের শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত দোযখের আগুন ছাড়া অন্য কিছু পাবে না। পরিশেষে পাপের শাস্তি ভোগান্তে অবশ্য তারাও সৎকাজের প্রতিদান লাভ করবে।

আয়াতের সবচেয়ে স্পষ্ট তফসীর হচ্ছে এই যে, অত্র আয়াতে ঐসব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা তাদের যাবতীয় সৎকার্য শুধু পার্থিব ফায়দা হাসিলের জন্য করে থাকে, চাই সে আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী কাফের হোক, অথবা নামধারী মুসলমান হোক, যে পরকালকে মৌখিক স্বীকার করেও কার্যতঃ সেদিকে কোন লক্ষ্য রাখে না, বরং পার্থিব লাভের দিকেই সম্পূর্ণ মগ্ন ও বিভোর থাকে। তফসীরকার ইমামগণের মধ্যে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) মায়মুন ইবনে মেহ্রান ও মুজাহিদ (রহঃ) অত্র ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস انما الاعمال بالنيات দ্বারাও তৃতীয় অভিমতটির সমর্থন পাওয়া যায় যে, নিজের কাজের মধ্যে যে ব্যক্তি যেমন নিয়ত রাখবে, তার কাজটি তদ্রূপ ধর্তব্য হবে এবং তদনুযায়ী ফলাফল লাভ করবে। যে ব্যক্তি শুধু পার্থিব লাভ পেতে চায়, সে নগদ লাভই পায়, যে ব্যক্তি আখেরাতে পরিত্রাণ লাভ করতে চায়, সে আখেরাতের নেয়ামতই পাবে। আর যে ব্যক্তি উভয় জীবনের কল্যাণ কামনা করে, সে দো-জাহানে কল্যাণ ও কামিয়াবী হাসিল করবে। নিয়তের উপর সর্বকাজের ভিত্তি একথা সর্ব ধর্মে স্বীকৃত এক সনাতন মূলনীতি।—(তফসীরে-কুরতবী)।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) অত্র হাদীস বর্ণনা করে ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন, কোরআনের আয়াত مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا দ্বারা পূর্বোক্ত হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা কারো প্রতি জুলুম করেন না। সৎকর্মশীল মুমিন ব্যক্তিরা দুনিয়াতে আংশিক প্রতিদান লাভ করে থাকে এবং পূর্ণ প্রতিদান আখেরাতে লাভ করবে। আর কাফেররা যেহেতু আখেরাতের কোন ধ্যান-ধারণাই রাখে না, তাই তাদের প্রাপ্য হিস্যা ইহজীবনেই তাদেরকে পুরোপুরি ভোগ করতে দেয়া হয়। তাদের সৎকার্যাবলীর প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ, বস্তুগত উন্নতি ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দান করা হয়। অবশেষে যখন আখেরাতে উপস্থিত হবে, তখন সেখানে পাওয়ার মত তাদের প্রাপ্তব্য কিছুই থাকবে না।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ

অর্থাৎ, যারা শুধু দুনিয়াতেই নগদ পেতে চায়, আমি তদেরকে নগদই দান করি। তবে সেজন্য দুটি শর্ত রয়েছে। একটি শর্ত হচ্ছে—আমি যতটুকু ইচ্ছা করি, ততটুকুই দান করি, তাদের চেষ্টা বা চাহিদা মোতাবেক দান করা আবশ্যক নয়। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে—আমার হেকমত অনুসারে যাকে সমীচীন মনে করি, শুধু তাকেই নগদ দান করি। সবাইকে দিতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

১৭তম আয়াতে নবী করীম (সাঃ) এবং সত্যিকার মুমিনদের অবস্থা ঐসব লোকের মোকাবেলায় তুলে ধরা হয়েছে—যাদের চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছে শুধু দুনিয়া হাসিল করা। যেন দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারে যে, এই দুটি শ্রেণী কখনো সমকক্ষ হতে পারে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিশ্বমানবের জন্য রসূল হওয়া এবং যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান না আনে, সে যত ভাল কাজই করুক না কেন, তার গোমরাহ ও জাহান্নামী হওয়া ব্যক্ত করা হয়েছে।

অত্র আয়াতে بَيِّنَةٍ বলে কোরআন পাককে বোঝানো হয়েছে। شَاهِدٌ শব্দের ব্যাখ্যায় তফসীরকার ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। বয়ানুল-কোরআনে হযরত থানবী (রহঃ) লিখেছেন যে, এখানে 'শাহেদ' অর্থ পবিত্র কোরআনের اعجاز এ'জায বা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া যা কোরআনের প্রতিটি আয়াতের সাথে বর্তমান রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কোরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে, যে কোরআনের উপর কায়েম রয়েছে? আর কোরআনের সত্যতার একটি সাক্ষী তো খোদ কোরআনের সাথেই বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ, এর বিস্ময়করতা এবং মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া এবং দ্বিতীয় সাক্ষী ইতিপূর্বে তওরাতরূপে এসেছে, যা হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার রহমতস্বরূপ দুনিয়াবাসীর অনুসরণের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। কেননা, কোরআন যে আল্লাহ্ তাআলার সত্য কিতাব এই সাক্ষ্য তওরাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত ছিল।

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم
مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا
يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ
أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ
وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ
اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ
لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ
إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ
فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴿٢٨﴾

(২০) তারা পৃথিবীতেও আল্লাহ্‌কে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই, তাদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে; তারা শুনতে পারত না এবং দেখতেও পেত না। (২১) এরা সে লোক, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আর এরা যা কিছু মিথ্যা মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল, তা সবই তাদের থেকে হারিয়ে গেছে। (২২) আখেরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত, কোন সন্দেহ নেই। (২৩) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং স্বীয় পালনকর্তার সমীপে বিনতি প্রকাশ করেছে তারাই বেহেশতবাসী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। (২৪) উভয়পক্ষের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন অন্ধ ও বধির এবং যে দেখতে পায় ও শুনতে পায় উভয়ের অবস্থা কি এক সমান? তবুও তোমরা কি ভেবে দেখ না? (২৫) আর অবশ্যই আমি নূহ (আঃ)-কে তাঁর জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি, (তিনি বললেন) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। (২৬) তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারো এবাদত করবে না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের ভয় করছি। (২৭) তখন তাঁর কওমের কাফের প্রধানরা বলল—আমরা তো আপনাকে আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি না; আর আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না এবং আমাদের উপর আপনাদের কোন প্রাধান্য দেখি না, বরং আপনারা সবাই মিথ্যাবাদী বলে আমরা মনে করি। (২৮) নূহ (আঃ) বললেন—হে আমার জাতি! দেখ তো আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর থাকি, আর তিনি যদি তাঁর পক্ষ হতে আমাকে রহমত দান করে থাকেন, তারপরেও তা তোমাদের চোখে না পড়ে, তাহলে আমি কি উহা তোমাদের উপর তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চাপিয়ে দিতে পারি?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত নূহ (আঃ) যখন তাঁর জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন, তখন জাতি তাঁর নবুওয়ত ও রেসালতের উপর কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করেছিল। হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমে তাদের প্রতিটি উক্তির উপযুক্ত জবাব দান করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের একটি কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবনের বহু মূলনীতি ও মাসায়েলের তা'লীম দেয়া হয়েছে।

২৭ নং আয়াতে মুশরেকদের কতিপয় আপত্তি ও সন্দেহমূলক বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

হযরত নূহ (আঃ)-এর নবুওয়ত ও রেসালতের উপর তাদের প্রথম আপত্তি ছিল مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا আমরা তো দেখি যে আপনিও আমাদের মতই মানুষ মাত্র। আমাদের মত পানাহার করেন, হাট-বাজারে যাতায়াত করেন, নিদ্রা যান জাগ্রত হন, সবকিছু স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও আপনি নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল ও বার্তাবাহক বলে যে অস্বাভাবিক দাবী তুলেছেন, তা আমরা কিরূপে মানতে পারি? তারা মনে করত যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে রসূলরূপে কোন মানুষের প্রেরিত হওয়া সমীচীন নয়, বরং ফেরেশতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন তাঁর বিশেষত্ব সবাই ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় মানতে বাধ্য হয়।

২৮ নং আয়াতে ইহার জবাবে এরশাদ হয়েছে—

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ
عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ হওয়া নবুওয়ত ও রেসালতের পরিপন্থী নয়। বরং চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, মানুষের নবী মানুষ হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। যেন মানুষ অনায়াসে তাঁর কাছে দ্বীন শিক্ষা করতে পারে, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। মানুষ ও ফেরেশতার স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। যদি ফেরেশতাকে নবী করে পাঠানো হত, তবে তাঁর কাছে ধর্মীয় আদর্শ শিক্ষা করা এবং তা পালন করা মানুষের জন্য দুষ্কর ও অসম্ভব হত। কেননা, ফেরেশতাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, নিদ্রা-তন্দ্রার প্রয়োজন হয় না, রিপুর তাড়না নেই, মানবীয় প্রয়োজনের সম্মুখীন হন না। অতএব, তাঁরা মানুষের দুর্বলতা উপলব্ধি করে যথাবিহিত তা'লীম দিতে পারতেন না এবং তাদের পূর্ণ তাবেদারী করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হত না। এ প্রসঙ্গটি পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টভাবে বা ইশারা-ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি করার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ করলে তোমরাও অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবে যে, মানুষ আল্লাহ্‌র নবী হতে পারবে না—এমন কোন কথা নেই। তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাঁর কাছে এমন কোন অকাট্য প্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে— যা দেখে মানুষ সহজেই বোঝতে পারে যে, তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত পয়গম্বর বা বার্তাবহ। সাধারণ লোকের জন্য নবীর মু'জেযাই তাঁর নবুওয়তের সত্যতার আকাট্য প্রমাণ। এজন্যই হযরত নূহ (আঃ) বলেছেন যে, আমি আল্লাহ্‌র তরফ হতে স্পষ্ট দলীল, অকাট্য প্রমাণ ও অনুগ্রহ নিয়ে এসেছি। সুষ্ঠুভাবে চিন্তা-বিবেচনা করলে তোমরাও এটা অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু তোমদের ঈর্ষা-বিদ্বেষ তোমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও অন্ধ করেছে। তাই তোমরা অস্বীকার করে বসেছ এবং নিজেদের হঠকারিতার

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَآ اَنَا
بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا
تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ۭ اَفَلَا
تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَاۗىِٕنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ
لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ۭ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ښ اِنِّىْٓ اِذًا
لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا
فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ
بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاۗءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ
اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ۭ هُوَ رَبُّكُمْ ۣ
وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٤﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ
فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْۗءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَاُوْحِيَ اِلٰي نُوْحٍ
اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَىِٕسْ
بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا
وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٣٧﴾

(২৯) আর হে আমার জাতি! আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌র জিম্মায় রয়েছে। আমি কিন্তু ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত লাভ করবে। বরঞ্চ তোমাদেরই আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় দেখছি। (৩০) আর হে আমার জাতি! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তাহলে আমাকে আল্লাহ্ হতে রেহাই দেবে কে? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না? (৩১) আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভান্ডার রয়েছে এবং একথাও বলি না যে, আমি গায়বী খবরও জানি; একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা; আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত আল্লাহ্ তাদের কোন কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারী হব (৩২) তারা বলল—হে নূহ! আমাদের সাথে আপনি তর্ক করেছেন এবং অনেক কলহ করেছেন। এখন আপনার সেই আযাব নিয়ে আসুন, যে সম্পর্কে আপনি আমাদিগকে সতর্ক করেছেন, যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন। (৩৩) তিনি বলেন, উহা তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌ই আনবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তখন তোমরা পালিয়ে তাঁকে অপারগ করতে পারবে না। (৩৪) আর আমি তোমাদের নসীহত করতে চাইলেও তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে গোমরাহ করতে চান; তিনিই তোমাদের পালনকর্তা এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। (৩৫) তারা কি বলে? আপনি কোরআন রচনা করে এনেছেন? আপনি বলে দিন আমি যদি রচনা করে এনে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার, আর তোমরা যেসব অপরাধ কর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (৩৬) আর নূহ (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করা হলো যে, যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছে তাদের ছাড়া আপনার জাতির অন্য কেউ ঈমান আনবেন না। অতএব, তাদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হবেন না। (৩৭) আর আপনি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশ মোতাবেক একটি নৌকা তৈরী করুন এবং পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা ডুবে মরবে।

উপর অটল রয়েছে।

কিন্তু পয়গম্বরগণের মাধ্যমে আগত আল্লাহ্‌র রহমত জোর-জবরদস্তি মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জিনিষ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা সেদিকে আগ্রহান্বিত না হয়। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঈমানের অমূল্য দৌলত যা আমি নিয়ে এসেছি, আমার যদি সাধ্য থাকত তবে তোমাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও তোমাদেরকে তা দিয়েই দিতাম। কিন্তু এটি আল্লাহ্‌র চিরন্তন বিধানের পরিপন্থী। এ মূল্যবান সম্পদ জোর করে কারো মাথায় তুলে দেয়া যায় না। এতদ্দ্বারা আরো সাব্যস্ত হচ্ছে যে, জোর-জবরদস্তি কাউকে মুমিন বা মুসলমান বানানো কোন নবীর যুগেই বৈধ ও অনুমোদিত ছিল না। তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে বলে যারা মিথ্যা দুর্নাম রটনা করে তাদেরও একথা অজানা নয়। তথাপি অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদের অন্তরে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এহেন অপবাদ ছড়ানো হয়।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টতঃ বোঝা গেল যে, কোন ফেরেশতাকে নবীরূপে পাঠানো হয়নি কেন? কারণ, ফেরেশতারা অসাধারণ শক্তি ও ক্ষমতাসম্পন্ন। সবদিক থেকেই তাদের সত্তা মানুষের তুলনায় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সুতরাং, তাঁদের দেখলে তো ঈমান আনা বাধ্যতামূলক কাজ হত। নবীগণের সাথে যেরূপ ধৃষ্টতা ও হঠকারিতা করা হয়েছে, ফেরেশতাদের সামনে সেরূপ আচরণ করার কার সাধ্য ছিল? আর কোন পরাক্রমশালী শক্তির প্রভাবে বাধ্য হয়ে ঈমান আনা হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। বরং 'ঈমান বিল-গায়ব' অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার প্রবল পরাক্রম প্রত্যক্ষ না করেই তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করতে হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল— وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ অর্থাৎ, আমরা দেখছি যে, আপনার প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং আপনার আনুগত্য ও অনুসরণকারী সবাই আমাদের সমাজের মধ্যে সবচেয়ে ইতর, ও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন। তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাসম্পন্ন, ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখি না। এই উক্তির মধ্যে দু'টি দিক রয়েছে। এক হচ্ছে, আপনার দাবী যদি সত্য ও সঠিক হতো, তাহলে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গই তা সর্বাগ্রে গ্রহণ করত। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করছে; আর স্থূলবুদ্ধি ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তা মেনে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনার প্রতি ঈমান আনলে আমরাও আহম্মকরূপে পরিচিত ও ধিকৃত হব। দ্বিতীয় হচ্ছে— সমাজের নিকৃষ্ট, ইতর ও ছোট লোকগুলি আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। এক্ষণে আমরাও যদি আপনার আনুগত্য স্বীকার করি, তবে আমরাও মুসলমান ভাই হিসাবে তাদের সমকক্ষরূপে পরিগণিত হব, নামাযের কাতারে ও অন্যান্য মজলিসে তাদের সাথে এক বরাবর উঠাবসা করতে হবে। ফলে আমাদের আভিজাত্য ও কুলীনতার হানি হবে। অতএব, এ কাজ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বরং তাদের ঈমান কবুল করাটা আমাদের ঈমানের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। আপনি যদি তাদের নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়নের কথা বিবেচনা করতে পারি।

বাস্তবজ্ঞান বিবর্জিত কওমের জাহেল লোকেরা সমাজের দরিদ্র ও

দুর্বল শ্রেণীকে ইতর ও ছোটলোক সাব্যস্ত করেছিল—যাদের কাছে পার্থিব ধন-সম্পদ ও বিষয়-বৈভব ছিল না। মূলতঃ তা ছিল তাদের জাহেলী চিন্তাধারার ফল। বস্তুতঃপক্ষে ইজ্জত ও জিল্লতি, ধন-দৌলত বিদ্যা-বুদ্ধির অধীন নয়। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সম্পদ এবং সম্মানের মোহ একটি নেশার মত, যা অনেক সময় সত্য-ন্যায়কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, সত্য ও ন্যায় হতে বিচ্যুত করে। দরিদ্র ও দুর্বলদের সম্মুখে যেহেতু এরূপ কোন অন্তরায় থাকে না। কাজেই তারাই সর্বাগ্রে সত্য-ন্যায়কে বরণ করতে এগিয়ে আসে। প্রাচীনকাল হতে যুগে যুগে দরিদ্র-দুর্বলরাই সমসাময়িক নবীগণের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিল, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন ঈমানের আহ্বান সম্বলিত রসূলে পাক (সাঃ)-এর পবিত্র চিঠি লাভ করল, তখন গুরুত্ব সহকারে নিজেই ইহার তদন্ত-তাহকীক করতে মনস্থ করল। কেননা, সে তওরাত ও ইঞ্জীল কিতাব পাঠ করে করে সত্য নবীগণের আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে পুংখানুপুংখরূপে পারদর্শী ছিল। কাজেই তৎকালে আরব দেশের যেসব ব্যবসায়ী সিরিয়ায় উপস্থিত ছিল, তাদের একত্রিত করে উক্ত আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করে। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল যে, তাঁর অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণী। তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করল, ইহা তো সত্য রসূল হওয়ার লক্ষণ। কেননা, যুগে যুগে দরিদ্র-দুর্বল শ্রেণীই প্রথমে নবীগণের আনুগত্য স্বীকার করেছে।

মোদ্দাকথা, দরিদ্র ও দুর্বল লোকদেরকে ইতর এবং হেয় মনে করা চরম মূর্খতা ও অন্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইতর ও ঘৃণিত তারাই-যারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা মালিককে চিনে না, তার নির্দেশ মেনে চলে না। হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইতর ও কমীনা কে? তিনি উত্তর দিলেন— যারা বাদশাহ ও রাজকর্মচারীদের খোশামোদ-তোষামোদে লিপ্ত হয়, তারাই কমীনা ও ইতর। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রাঃ) বলেন, যারা দ্বীন-ধর্ম বিক্রি করে দুনিয়া হাসিল করে তারাই কমীনা। পুনরায় প্রশ্ন করা হল—সবচেয়ে কমীনা কে? তিনি জবাব দিলেন—যে ব্যক্তি অন্যের পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের দ্বীন ও ঈমানকে বরবাদ করে। হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-গণের নিন্দা-সমালোচনা করে, সে-ই ইতর ও অর্বাচীন। কারণ, তাঁরাই সমগ্র উম্মতের সর্বাপেক্ষা হিত সাধনকারী। তাঁদের মাধ্যমেই ঈমানের অমূল্য দৌলত ও শরীয়তের আহকাম সকলের কাছে পৌঁছেছে।

যাহোক, ২৯ নং আয়াতে কওমের লোকদের মূর্খতা প্রসূত ধ্যান-ধারণা খন্ডন করার জন্য **প্রথমতঃ** বলা হয়েছে যে, কারো ধন-সম্পদের প্রতি নবী-রসূলগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তাঁরা নিজেদের খেদমত ও তা'লীম-তবলীগের বিনিময়ে কারো থেকে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। তাঁদের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই দায়িত্বে। কাজেই, তাঁদের দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র এক সমান। তোমরা এমন অহেতুক আশঙ্কা পোষণ করো না যে, আমরা ধন-সম্পদশালীরা যদি ঈমান আনয়ন করি তবে হয়ত আমাদের বিত্ত-সম্পদে ভাগ বসানো হবে।

দ্বিতীয়তঃ তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা ঈমান আনার পূর্বশর্ত হিসাবে চাপ সৃষ্টি করছ যেন আমি দীন-দরিদ্র ঈমানদারগণকে তাড়িয়ে দেই। কিন্তু আমার দ্বারা তা কখনো সম্ভবপর নয়। কারণ, আর্থিক দিক দিয়ে তারা দরিদ্র হলেও আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে তাদের প্রবেশাধিকার ও উচ্চমর্যাদা রয়েছে। এমন লোকদেরকে তাড়িয়ে দেয়া অন্যায়-অসঙ্গত।

وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ "আর আমি গায়বও জানি না।" কেননা, উক্ত জাহেলদের আরো বিশ্বাস ছিল যে, যারা সত্যিকার পয়গম্বর, তাঁরা নিশ্চয়ই গায়বের খবর জানবেন। হযরত নূহ (আঃ)-এর উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবুওয়ত ও রেসালতের জন্য গায়বের এল্‌ম অপরিহার্য নয়। আর তা হবেই বা কি করে? গায়বের এল্‌ম তো একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ ছেফত বা বৈশিষ্ট্য। কোন নবী, ওলী বা ফেরেশতা ইহার অংশীদার হতে পারে না। তাঁদের অত্র গুণে গুণান্বিত মনে করা স্পষ্ট শেরেকী। অবশ্য হাঁ, আল্লাহ্ তাআলা তদীয় পয়গম্বরগণের মধ্যে যাঁকে যতটুকু ইচ্ছা অদৃশ্য জগতের এল্‌ম দান করেন। ইহা নবী-ওলীগণের এখতিয়ারভুক্ত নয় যে, তাঁরা যখন-তখন যে কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে বা বলতে পারবেন। আল্লাহ্ তাআলা যখন অবহিত করেন, তখন তাঁদের জন্য তা আর গায়ব থাকে না। অতএব, একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে আলেমুল-গায়ব বলা হারাম ও শেরেকী।

তাঁর তৃতীয় উক্তি হয়েছে— وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ "আর আমি একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা।" এখানে তাদের এ ভ্রান্ত চিন্তাধারা বাতিল করা হয়েছে যে, নবী-রসূলরূপে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ফেরেশতা প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় ছিল।

তাঁর চতুর্থ কথা হচ্ছে—তোমাদের দৃষ্টি দ্বারা দরিদ্র ঈমানদারগণকে যেরূপ লাঞ্ছিত, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র দেখছ, আমি কিন্তু তোমাদের মত একথা বলতে পারি না যে, আল্লাহ্ তাদের কোন কল্যাণ ও কামিয়াবী দান করবেন না। কারণ, প্রকৃত কল্যাণও কামিয়াবী ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতার জোরে হাসিল করা যায় না। বরং মানুষের অন্তরের অবস্থা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তা দান করা হয়। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই সম্যক অবহিত আছেন যে, কল্যাণ ও কামিয়াবী হাসিল করার জন্য কার অন্তর যোগ্য, আর কার অন্তর অযোগ্য। অতএব, তিনিই তার ফয়সালা করবেন।

পরিশেষে হযরত নূহ (আঃ) বলেন, তোমাদের মত আমিও যদি দরিদ্র ঈমানদারগণকে লাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত মনে করি, তাহলে আমিও জালেমরূপে পরিগণিত হবো।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রায় এক হাজার বছরের দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। সাথে সাথে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়া ও দেশবাসীকে সুপথে পরিচালিত করার চিন্তা-ভাবনা এবং পয়গম্বরসুলভ উৎসাহ-উদ্দীপনা এতদূর দান করেছিলেন যে, সারাজীবন তিনি অক্লান্তভাবে নিজ জাতিকে তওহীদ ও সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কওমের পক্ষ হতে তিনি কঠিন নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হন, তাঁর উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়; এমনকি তিনি অনেক সময় রক্তাক্ত হয়ে বেহুশ হয়ে পড়তেন। অতঃপর হুশ হলে পরে দোয়া করতেন—আয় আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা অজ্ঞ-মূর্খ, তারা জানে না, বোঝে না। তিনি এক পুরুষের পরে দ্বিতীয় পুরুষকে অতঃপর তৃতীয় পুরুষকে শুধু এ আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, হযরত তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা যখন ঈমান আনল না, তখন তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে তাদের সম্পর্কে ফরিয়াদ করলেন—

إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। আমার দাওয়াত তাদের শুধু সত্যপথ থেকে পলায়নের প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।'—(সূরা নূহ)

সুদীর্ঘকাল যাবত অসহনীয় কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করার পর তিনি দোয়া করেন— رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ হে আল্লাহ্! আমার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। কেননা, ওরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। —(১৮ পারা, আয়াত ৩৯ সূরা আল-মুমেনুন।)

দেশবাসীর জুলুম-নির্যাতন, অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ সীমা অতিক্রম করার পর আল্লাহ্ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)-কে উপরোক্ত আয়াত দ্বারা উদ্বুদ্ধ করেন।—(বগভী ও মাযহারী)

৩৩ নং আয়াতে হযরত নূহ (আঃ)-কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আপনার কওমের মধ্যে যাদের ঈমান আনার যোগ্যতা ছিল, তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। ধৃষ্টতা ও হঠকারিতার কারণে তাদের অন্তর মোহরাঙ্কিত হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তাদের জন্য চিন্তিত, দুঃখিত বা বিমর্ষ হবেন না।

৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, অচিরেই আমি এ জাতির উপর মহাপ্লাবন আকারে আযাব অবতীর্ণ করব। কাজেই আপনি একখানি নৌকা তৈরী করুন যার মধ্যে আপনার পরিজনবর্গ, অনুসারীবৃন্দ ও প্রয়োজনীয় রসদপত্র ও উপকরণাদিসহ স্থান সঙ্কুলান হয়। যেন উহাতে আরোহণ করে প্লাবনের দিনগুলি নিরাপদে অতিবাহিত করতে পারেন। হযরত নূহ (আঃ) নৌকা তৈরী করলেন। অতঃপর প্লাবনের প্রাথমিক আলামত হিসাবে ভূমি হতে পানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল। নূহ (আঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হল সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় আরোহণ করাবার জন্য। আর মানুষের প্রয়োজনীয় ঘোড়া, গাধা, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রাণীর এক-এক জোড়া নৌকায় তুলে নেয়ার আদেশ দেয়া হল। তিনি আদেশ পালন করলেন।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও নৌকায় আরোহণকারীরা সংখ্যায় অতি অল্প ছিল।

আলোচ্য আয়াতগুলি সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এতক্ষণ বলা হল, এবার প্রত্যেক আয়াতের ব্যাখ্যা ও আনুষঙ্গিক মাসায়েল বর্ণনা করা হচ্ছে।

৩৬ নং আয়াতে এরশাদ করেছেন— হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছিল যে, তাঁর জাতির মধ্যে ভবিষ্যতে আর কেউ ঈমান আনবে না। তারা আপনার সাথে যেসব দুর্ব্যবহার করেছে আপনি তাতে চিন্তিত ও বিমর্ষ হবেন না। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা-অস্থিরতা থাকে। নিরাশ হওয়ার মধ্যেও এক প্রকার শান্তি রয়েছে। অতএব, আপনি তাদের সংশোধনের আশা ত্যাগ করুন এবং তাদের পরিণতি দেখার অপেক্ষায় থাকুন।

৩৭ নং আয়াতে তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। এরূপ অবস্থায়ই হযরত নূহ(আঃ)-এর মুখে তাঁর কওম সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছিল—

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ

يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার! এখন এই কাফেরদের মধ্যে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী কাউকে রাখবেন না। যদি তাদের রাখেন, তবে তাদের ভবিষ্যত বংশধররাও অবাধ্য কাফের হবে। (পারা ২৯ – সূরা নূহ, আয়াত ২৬)

এই বদদোয়া আল্লাহ্র দরবারে কবুল হল। যার ফলে সমস্ত কওমে নূহ (আঃ) ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

হযরত নূহ (আঃ)-কে নৌকা তৈরী শিক্ষা দান ঃ হযরত নূহ (আঃ)-কে যখন নৌকা তৈরীর নির্দেশ দেয়া হল, তখন তিনি নৌকাও চিনতেন না, তৈরী করতেও জানতেন না। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেন — وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا 'আর আপনি নৌকা তৈরী করুন আমার তত্ত্বাবধানে ও ওহী অনুসারে"। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নৌকা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল ওহীর মাধ্যমে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি শাল কাঠ দ্বারা উক্ত নৌকা তৈরী করেছিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নৌকাখানি ৩০০ গজ দীর্ঘ, ৫০ গজ প্রস্থ, ৩০ গজ উঁচু ও ত্রিতল বিশিষ্ট ছিল। উহার দুইপার্শ্বে অনেকগুলি জানালা ছিল। এভাবে ওহীর মাধ্যমে হযরত নূহ (আঃ)-এর হাতে নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল। অতঃপর যুগে যুগে তার উন্নতি সাধিত হয়ে চলেছে।

প্রতিটি শিল্পকর্মের সূচনা ওহীর মাধ্যমে হয়েছে ঃ হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রচিত "আত-তিববুন-নববী" কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার শিল্পকর্ম ওহীর মাধ্যমে কোন নবীর পবিত্র হস্তে শুরু হয়েছে। অতঃপর প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে তার মধ্যে উন্নতি-অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি যেসব ওহী নাযিল করা হয়েছিল তার অধিকাংশ ছিল ভূমি আবাদ করা, কৃষিকার্য ও শিল্পসংক্রান্ত। পরিবহনের জন্য চাকা চলতি গাড়ী হযরত আদম (আঃ)-ই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন, কালের বিবর্তনে বিভিন্ন প্রকার গাড়ী আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু সব গাড়ীর ভিত্তি চাকার উপর। গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী হতে শুরু করে মোটর ও রেলগাড়ী সর্বত্র চাকার কারবার। কাজেই, যিনি সর্বপ্রথম চাকা আবিষ্কার করেছেন তিনিই সবচেয়ে বড় আবিষ্কারক। আর একথা আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নবী হযরত আদম (আঃ)-ই ওহীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম চাকার আবিষ্কার করেছিলেন।

এদ্বারা আরো বোঝা গেল যে, মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন। তাই আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রসূলগণকে ওহীর সাহায্যে তা শিক্ষাদান করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)-কে নৌকা নির্মাণপদ্ধতি ও কলা-কৌশল শিক্ষা দানের সাথে সাথে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনার কওমের উপর এক মহাপ্লাবন আসবে, তারা সবাই ডুবে মরবে, তখন আপনি স্নেহপরবশ হয়ে তাদের জন্য কোন সুপারিশ যেন না করেন।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ؕ
قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ
مُّقِيْمٌ ﴿٣٩﴾ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ
كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
وَمَنْ اٰمَنَ ؕ وَمَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٤٠﴾ وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ
اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤١﴾ وَهِيَ تَجْرِيْ
بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۫ وَنَادٰى نُوْحُ ابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ
مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَاٰوِيْۤ
اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ
اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿٤٣﴾
وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ
وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ
اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٤٥﴾

(৩৮) তিনি নৌকা তৈরী করতে লাগলেন, আর তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পার্শ্ব দিয়ে যেত, তখন তাঁকে বিদ্রূপ করত। তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রূপ তোমাদের উপহাস করছি। (৩৯) অতঃপর অচিরেই জানতে পারবে—লাঞ্ছনাজনক আযাব কার উপর আসে এবং চিরস্থায়ী আযাব কার উপর অবতরণ করে। (৪০) অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল এবং ভূ-পৃষ্ঠ উচ্ছসিত হয়ে উঠল, আমি বললাম ঃ সর্বপ্রকার জোড়ার দুটি করে এবং যাদের উপরে পূর্বাহ্নেই হুকুম হয়ে গেছে তাদের বাদ দিয়ে, আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিন। বলাবাহুল্য, অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল। (৪১) আর তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহ্‌র নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ণ, মেহেরবান। (৪২) আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে, আর নূহ্ (আঃ) তাঁর পুত্রকে ডাক দিলেন আর সে সরে রয়েছিল, তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথে থেকো না। (৪৩) সে বলল, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ (আঃ) বললেন, আজকের দিনে আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হল। (৪৪) আর নির্দেশ দেয়া হল — হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ, ক্ষান্ত হও। আর পানি হ্রাস করা হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হল, দুরাত্মা কাফেররা নিপাত যাক। (৪৫) আর নূহ্ (আঃ) তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললেন— হে পরওয়ারদেগার, আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৩৮ নং আয়াতে নৌকা তৈরীকালীন সময়ে নূহ (আঃ)-এর কওমের উদাসীনতা, গাফলতি,অবজ্ঞা ও দুঃসাহস এবং এর শোচনীয় পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে হযরত নূহ (আঃ) যখন নৌকা নির্মাণকার্যে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করত, আপনি কি করছেন? তিনি উত্তর দিতেন, অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লাবন হবে, তাই নৌকা তৈরী করছি। তখন তারা বলত –"এখানে তো পান করার মত পানিও দুর্লভ, আর আপনি ডাঙ্গা দিয়ে জাহাজ চালাবার ফিকিরে আছেন।" তদুত্তরে হযরত নূহ (আঃ) বলতেন, যদিও আজ তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস করছ, কিন্তু মনে রেখো, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করব। অর্থাৎ, তোমরা উপহাসের পাত্র হবে। বস্তুতঃ নবীগণ কখনো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন না। কাউকে উপহাস করা তাঁদের শান ও মর্যাদার পরিপন্থী, বরং হারাম। কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে—

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ

অর্থাৎ, "এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে উপহাস করবে না। হতে পারে যে, উপহাসকারীদের চেয়ে যাদের উপহাস করা হচ্ছে (আল্লাহ্‌র কাছে) তারাই শ্রেষ্ঠতর।" (পারা ২৬ঃ সূরা হুজুরাত, ১১ আয়াত) সুতরাং পূর্বোক্ত আয়াতে উপহাস করার অর্থ কাজের মাধ্যমে জবাব দেয়া। সেমতে 'আমরা তোমাদেরকে উপহাস করব' বাক্যের অর্থ হচ্ছে– তোমরা যখন আযাবে পতিত হবে, তখন আমরা তোমাদেরকে বলব যে, 'এটা তোমাদের উপহাসের মর্মান্তিক পরিণতি।' যেমন ৩৯ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, "অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কাদের উপর লাঞ্ছনাজনক আযাব আসছে এবং চিরস্থায়ী আযাব কাদের উপর হয়।" প্রথম عذاب শব্দের দ্বারা দুনিয়ার আযাব এবং عَذَابٌ مُّقِيْمٌ দ্বারা আখেরাতের চিরস্থায়ী আযাব উদ্দেশ্য।

৪০ আয়াতে প্লাবন আরম্ভকালীন করণীয় ও আনুষঙ্গিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে—

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ

অর্থাৎ, 'অবশেষে যখন আমার ফয়সালা কার্যকরী করার সময় হল এবং উনুন হতে পানি উথলে উঠতে লাগল।'

التَّنُّوْرُ তান্নুর শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। ভূপৃষ্ঠকেও তান্নুর বলা হয়, রুটি পাকানের তন্দুরকেও তান্নুর বলে, যমীনের উঁচু অংশকেও তান্নুর বলে। তাই তফসীরকার ইমামগণের কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতে তান্নুর অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি হয়ে পানি উথলে উঠছিল। কেউ কেউ বলেন— এখানে তান্নুর বলে হযরত আদম (আঃ)-এর রুটি পাকানো তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে, যা সিরিয়ার عين ورده 'আইনে আরদাহ' নামক স্থানে অবস্থিত। উক্ত তন্দুরের ভেতর থেকেই সর্বপ্রথম পানি উঠতে শুরু করেছিল। কেউ বলেন — এখানে হযরত নূহ (আঃ)-এর তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে–যা কূফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল। হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, শা'বী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ অধিকাংশ মুফাসসেরীন এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শা'বী (রহঃ) কসম করে বলেছেন যে, উক্ত তন্দুর কূফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কূফার বর্তমান মসজিদের মধ্যবর্তী

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর নৌকা তৈরী করেছিলেন। আর তন্দুর ছিল ঐ ...দের প্রবেশ দ্বার।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা ... নূহ (আঃ)-কে মহাপ্লাবনের পূর্বাভাসস্বরূপ আগেই জানিয়ে ...ছেন যে, যখন আপনার ঘরের উনুন ফেটে পানি উঠতে দেখবেন, ... বুঝবেন যে, মহাপ্লাবন শুরু হয়েছে।— (তফসীরে-কুরতুবী ও ...রী)

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, তান্নুর শব্দের ব্যাখ্যায় মতভেদ ...লক্ষিত হলেও আসলে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, প্লাবন যখন শুরু ...ছে, তখন রুটি পাকানো তন্দুর হতেও পানি উঠেছে, সমতলভূমি ...ও উঠেছে আর উঁচু যমীন হতেও পানি উঠেছে। সিরিয়ার আইনুল ...দার তন্দুর হতেও উঠেছে এবং কূফার তন্দুর হতেও উঠেছে। অল্প ...য়েই সব একাকার হয়েছে। যেমন কোরআন পাকের আয়াতে স্পষ্ট ...শাদ করা হয়েছে—

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا

অর্থাৎ, 'অতঃপর আমি মুষলধারায় বর্ষণের সাথে সাথে আসমানের ...সমূহ খুলে দিলাম এবং যমীনে প্রস্রবণরূপে প্রবাহমান করলাম।— (২৭ ...রাঃ সূরা আল-কামার, আয়াত-১১)

ইমাম শা'বী (রঃ) আরো বলেছেন যে, কূফার এই জা'মে মসজিদটি ...জিদে হারাম, মসজিদে-নববী ও মসজিদে-আকসার পর বিশেষ ...শিষ্ট্যসম্পন্ন বিশ্বের চতুর্থ মসজিদ।

তুফান শুরু হওয়া মাত্র হযরত নূহ (আঃ)-কে হুকুম দেয়া হল—

احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

অর্থাৎ, 'জোড়বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণী এক-এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিন।' এতদ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাহাজে সারা দুনিয়ার সব ধরনের প্রাণীর সমাবেশ করা হয়নি। বরং যেসব প্রাণী স্ত্রী-পুরুষের মিলনে জন্ম হয় এবং পানির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না, শুধু সেসব পশু-পাখীই উঠানো হয়েছিল জলজ প্রাণী উঠানো হয়নি। ...জার প্রাণীকুলের মধ্যে যেসব পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, পুরুষ-স্ত্রীর মিলন ছাড়াই জন্ম হয় তাও বাদ পড়েছে। শুধু গরু, ছাগল, ঘোড়া-গাধা ইত্যাদি গৃহপালিত ও অতীব প্রয়োজনীয় পশু-পাখী কিশতিতে উঠানো হয়েছিল। এতদ্বারা এ সন্দেহ দূরীভূত হল যে, সারা দুনিয়ার সর্বপ্রকার প্রাণীকুলের স্থান সঙ্কুলান এতটুকু কিশতিতে কিভাবে হলো?

অতঃপর হযরত নূহ (আঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বেঈমান কাফেরদের বাদ দিয়ে আপনার পরিজনবর্গকে এবং সমস্ত ঈমানদারগণকে কিশতিতে তুলে নিন। তবে তৎকালে ঈমানদারদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল।

জাহাজে আরোহণকারীদের সঠিক সংখ্যা কোরআনে ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৮০ জন। যাদের মধ্যে হযরত নূহ (আঃ)-এর তিন পুত্র হাম, সাম, ইয়াফেস এবং তাদের ৩ জন স্ত্রীও ছিল। নূহ (আঃ)-এর চতুর্থ পুত্র কেন'আন কাফেরদের সাথে থাকায় সে ডুবে মরেছিল।

যানবাহনে আরোহণের আদব : ৪১ আয়াতে নৌকা-জাহাজ ইত্যাদি জল-যানে আরোহণ করার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ বলে আরোহণ করবে।

مجرى মাজরে' অর্থ চলা, গতিশীল হওয়া।

مرسى 'মুরসা' অর্থ স্থিতি বা থামা। অর্থাৎ, অত্র কিশতির গতি ও স্থিতি আল্লাহ্‌র নামে, এর চলা ও থামা আল্লাহ্ তাআলার মর্জি ও কুদরতের অধীন।

প্রতিটি যানবাহনের গতি-স্থিতি আল্লাহ্‌র কুদরতের অধীন : সামান্য চিন্তা করলেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারত যে, জলযান, স্থলযান, ও শূন্যযান অথবা কোন জানদার সওয়ারী হোক, তা সৃষ্টি বা নির্মাণ করা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। স্থূলদৃষ্টিতে মানুষ হয়ত এই বলে আস্ফালন করতে পারে যে, আমরা তা তৈরী করেছি, আমরা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে তার লোহা-লক্কড়, তামা-পিতল, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি মূল উপাদান ও কাঁচামাল তারা সৃষ্টি করে না। এক তোলা লোহা বা এক ইঞ্চি কাঠ তৈরী করার ক্ষমতাও তাদের নেই। অধিকন্তু উক্ত কাঁচামাল দ্বারা রকমারী যন্ত্রাংশ তৈরী করার কলাকৌশল তাদের মস্তিষ্কে কে দান করেছেন? মানুষ শুধু নিজ বুদ্ধির জোরে যদি তা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করতে পারত, তাহলে দুনিয়ায় কোন নির্বোধ লোক থাকত না। সবাই এরিস্টটল, প্লেটো, এডিসন বনে যেত। কোথাকার কাঠ, কোন খনির লোহা, আর কোন দেশের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যানবাহনের কাঠামো তৈরী হয়। অতঃপর শত-শত টন, হাজার হাজার মণ মালামাল বহন করে যমীনের উপর দৌড়ানো বা হাওয়ার উপর উড়ার জন্য যে শক্তি অপরিহার্য তা পানি ও বায়ুর ঘর্ষণে বিদ্যুতরূপে হোক বা জ্বালানী তেল ইত্যাদি হোক সর্বাবস্থায় চিন্তা করে দেখুন, তন্মধ্যে কোনটি মানুষ সৃষ্টি করেছে? বায়ু বা পানি কি সে সৃষ্টি করেছে? তৈল বা পেট্রোল কি সে সৃষ্টি করেছে? তার অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন শক্তি কি মানুষ সৃষ্টি করেছে?

মানুষ যদি বিবেককে সামান্য কাজে লাগায়, তাহলে অনায়াসে অনুধাবন করতে পারে যে, বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কারের যুগেও মানুষ একেবারে অক্ষম ও অসহায়। আর এটি অনস্বীকার্য সত্য যে, প্রত্যেকটি যানবাহনের গতি ও স্থিতি, নিয়ন্ত্রণ ও হেফাযত একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের অধীন।

আত্মভোলা মানুষ তাদের বাহ্যিক জোড়া-তালির কার্যকলাপ যাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নাম দিয়েছে তার উপর গৌরব ও অহংকারের নেশায় এমন মাতাল হয়েছে যে, মৌলিক সত্যটি তাদের চোখে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এহেন বিভ্রান্তির বেড়াজাল হতে মানুষকে মুক্ত করার জন্যই আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে স্বীয় পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন।

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا একমাত্র আল্লাহ্‌র নামেই এর গতি ও স্থিতি বলে মৌল সত্যকে চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটি মাত্র দুই শব্দবিশিষ্ট একটি বাক্য হলেও বস্তুতঃ এটা এমন একটা ধারণার প্রতি পথনির্দেশ করে, যদ্দ্বারা মানুষ বস্তুজগতে বসবাস করেও ভাবজগতের অধিবাসীতে পরিণত হয় এবং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে সৃষ্টিকর্তার বাস্তব উপস্থিতি অবলোকন করতে সক্ষম হয়।

মুমিনের দুনিয়াদারী ও কাফেরের দুনিয়াদারীর মধ্যে এখানেই স্পষ্ট ব্যবধান। যানবাহনে উভয়েই আরোহণ করে, কিন্তু মুমিন যখন কোন

যানবাহনে আরোহণ করে, তখন সে শুধু যমীনের দূরত্বই অতিক্রম করে না, বরং আধ্যাত্মিক জগতেও পরিভ্রমণ করে থাকে।

৪২ ও ৪৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ্ (আঃ)-এর পরিজনবর্গ কিশতিতে আরোহণ করল, কিন্তু 'কেনআন' নামক একটি ছেলে বাইরে রয়ে গেল। তখন পিতৃসুলভ স্নেহবশতঃ হযরত নূহ্ (আঃ) তাকে ডেকে বললেন, প্রিয় বৎস, আমাদের সাথে নৌকায় আরোহণ কর; কাফেরদের সাথে থেক না, তাহলে পানিতে ডুবে মরবে। কাফের ও দুশমনদের সাথে উক্ত ছেলেটির যোগ-সাজস ছিল এবং সে নিজেও কাফের ছিল। কিন্তু হযরত নূহ্ (আঃ) তার কাফের হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবহিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে যদি তিনি তার কুফরী সম্পর্কে অবহিত থেকে থাকেন, তাহলে তাঁর আহবানের মর্ম হবে-নৌকায় আরোহণের পূর্বশর্ত হিসাবে কুফরী হতে তওবা করে ঈমান আনার দাওয়াত এবং কাফেরদের সংসর্গ পরিত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হতভাগা 'কেনআন' তখনও প্লাবনকে অগ্রাহ্য করে বলছিল— আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে প্লাবন হতে আত্মরক্ষা করব। হযরত নূহ (আঃ) পুনরায় তাকে সতর্ক করে বললেন যে,— আজকে কোন উঁচু পর্বত বা প্রাসাদ কাউকে আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্র খাস রহমত ছাড়া বাঁচার অন্য কোন উপায় নেই। দূর থেকে পিতা-পুত্রের কথোপকথন চলছিল। এমন সময় সহসা এক উত্তাল তরঙ্গ এসে উভয়ের মাঝে অন্তরালের সৃষ্টি করল এবং কেনআনকে নিমজ্জিত করল। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, হযরত নূহ্ (আঃ)-এর তুফানের সময় এক একটি ঢেউ বড় বড় পাহাড়ের চূড়া হতে ১৫ গজ এবং কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় ৪০ গজ উচ্চতা বিশিষ্ট ছিল।

আলোচ্য ৪৪ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, যমীন ও আসমান হুকুম পালন করল, প্লাবন সমাপ্ত হল, জুদী পাহাড়ে নৌকা ভিড়ল আর বলে দেয়া হল যে, দুরাত্মা কাফেররা চিরকালের জন্য আল্লাহ্র রহমত হতে দুরীভূত হয়েছে।

জুদী পাহাড় বর্তমানেও ঐ নামেই পরিচিত। সেটি হযরত নূহ্ (আঃ)-এর মূল আবাসভূমি, ইরাকের মোসেল শহরের উত্তরে ইবনে ওমর দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত।

বস্তুতঃ এটি একটি পর্বতমালার অংশবিশেষের নাম। এর অপর এক অংশের নাম আরারাত পর্বত। বর্তমান তওরাতে দেখা যায় যে, হযরত নূহ্ (আঃ) এর কিশতি আরারাত পর্বতে ভিড়েছিল। উভয় বর্ণনার মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নাই। প্রাচীন ইতিহাসে প্রচলিত বর্ণনায়ও দেখা যায় যে, জুদী পাহাড়েই কিশতি ভিড়েছিল। প্রাচীন ইতিহাসে আরো উল্লেখ আছে যে, ইরাকের বিভিন্নস্থানে উক্ত কিশতির ভগ্ন টুকরা এখনো অনেকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে, যা বরকতের জন্য সংরক্ষিত হয় এবং রোগ ব্যাধিতে ব্যবহার করা হয়।

তফসীরে তাবারী ও বগভীতে আছে যে, হযরত নূহ্ (আঃ) ১০ই রজব কিশতিতে আরোহণ করেছিলেন। দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত উক্ত কিশতি তুফানের মধ্যেই চলছিল। যখন কা'বা শরীফের পার্শ্বে পৌঁছল, তখন সাত বার কা'বা শরীফের তওয়াফ করল। আল্লাহ্ তাআলা বায়তুল্লাহ্ শরীফকে পানির উপরে তুলে রক্ষা করেছিলেন। পরিশেষে ১০ই মুহাররম অর্থাৎ, আশুরার দিন জুদী পাহাড়ে কিশতি ভিড়ল। হযরত নূহ্ (আঃ) স্বয়ং সেদিন শোকরানার রোযা রাখলেন এবং সহযাত্রী সবাইকে রোযা পালনের নির্দেশ দিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কিশতিতে অবস্থানরত যাবতীয় প্রাণীও সেদিন রোযা পালন করেছিল।— (তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী)

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا
تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّیْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ
الْجٰهِلِیْنَ ﴿۴۶﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّیْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَیْسَ لِیْ
بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِیْ وَتَرْحَمْنِیْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿۴۷﴾
قِیْلَ یٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَیْكَ وَعَلٰۤی اُمَمٍ
مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ یَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿۴۸﴾
تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْهَاۤ اِلَیْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ
وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛؕ فَاصْبِرْ ۛؕ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِیْنَ ﴿۴۹﴾
وَاِلٰی عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿۵۰﴾ یٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَیْهِ
اَجْرًا ؕ اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلَی الَّذِیْ فَطَرَنِیْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۵۱﴾
وَیٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّمَآءَ
عَلَیْكُمْ مِّدْرَارًا وَّیَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰی قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا
مُجْرِمِیْنَ ﴿۵۲﴾ قَالُوْا یٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَیِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ
بِتَارِكِیْۤ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِیْنَ ﴿۵۳﴾

(৪৬) আল্লাহ্ বলেন— হে নূহ্! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চই সে দুরাচার! সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না, যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না। (৪৭) নূহ্ (আঃ) বলেন— হে আমার পালনকর্তা! আমার যা জানা নেই এমন কোন দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। (৪৮) হুকুম হল—হে নূহ্ (আঃ)! আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা এবং আপনার নিজের ও সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলির উপর বরকত সহকারে অবতরণ করুণ। আর অন্যান্য যেসব সম্প্রদায় রয়েছে আমি তাদেরকেও উপকৃত হতে দেব। অতঃপর তাদের উপর আমার দারুন আযাব আপতিত হবে। (৪৯) এটি গায়বের খবর, আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করছি। ইতিপূর্বে এটা আপনার এবং আপনার জাতির জানা ছিল না। আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। যারা ভয় করে চলে, তাদের পরিণাম ভাল, সন্দেহ নেই। (৫০) আর আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছি; তিনি বলেন — হে আমার জাতি, আল্লাহ্র বন্দেগী কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নেই, তোমরা সবাই মিথ্যা আরোপ করছ। (৫১) হে আমার জাতি! আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন মজুরী চাই না; আমার মজুরী তাঁরই কাছে যিনি আমাকে পয়দা করেছেন; তবু তোমরা কেন বোঝ না? (৫২) আর হে আমার কওম! তোমাদের পালন কর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর; তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মত বিমুখ হয়ো না (৫৩) তারা বলল— হে হূদ, তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আস নাই, আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৪৬ আয়াতে আল্লাহ্র পক্ষ হতে হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, মন-মানসিকতার দিক দিয়ে এ ছেলেটি আপনার পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নেই। সে একজন দুরাত্মা কাফের। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা না জেনে আমার কাছে কোন আবেদন করা আপনার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যতে অজ্ঞতা-সুলভ কাজ না করার জন্য আমি আপনাকে নসীহত করছি।

আল্লাহ্ তাআলার অত্র ফরমানের মধ্যে দু'টি বিষয় জানা গেল। প্রথম এই যে, হযরত নূহ্ (আঃ) উক্ত পুত্রটির চূড়ান্ত কাফের হওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, বরং তার মুনাফেকীর কারণে তিনি তাকে ঈমানদার মনে করেছিলেন। তাই তিনি তার জন্য দোয়া করেছিলেন। জানা থাকলে তিনি কিছুতেই এমন দোয়া করতেন না। কেননা আল্লাহ্ তাআলা নূহ (আঃ)-কে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, وَلَا تُخَاطِبْنِیْ فِی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ 'অতঃপর মহাপ্লাবন যখন শুরু হবে, আপনি তখন কোন অবাধ্য কাফেরের জন্য আমার কাছে সুপারিশ করবেন না।'— এহেন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের দুঃসাহস করা কোন নবীর পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুতঃপক্ষে এটি কুফরী অবস্থায় কেনআনকে রক্ষা করার আবদার ছিল না। বরং তাকে ঈমান দান করার জন্য খোদার দরবারে আকুল আবেদন ছিল। কিন্তু হযরত নূহ্ (আঃ)-এর মত একজন বিশিষ্ট নবী কর্তৃক ভালমত না জেনে-শুনে এরূপ দোয়া করাকেও আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন নি, বরং এরূপ দোয়া তাঁর জন্য অসমীচীন হয়েছে বলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। পয়গম্বরের উচ্চ মর্যাদার পক্ষে এটি এমন একটি ত্রুটি যা পরবর্তীকালে তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। তাই হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি যখন তাঁর কাছে সুপারিশের অনুরোধ জানাবে, তখনও তিনি উক্ত ত্রুটিকে ওজর হিসাবে তুলে ধরে বলবেন যে, আমি এমন একটি ভুল করেছি, যার ফলে আজ সুপারিশ করার হিম্মত হয় না।

কাফের ও যালেমের জন্য দোয়া করা জায়েয নয় : উপরোক্ত বয়ান দ্বারা একটি মাসআলা জানা গেল যে, দোয়াকারীর কর্তব্য হচ্ছে যার জন্য ও যে কাজের জন্য দোয়া করা হবে— তা জায়েয, হালাল ও ন্যায়সঙ্গত কি না তা জেনে নেয়া। সন্দেহজনক কোন বিষয়ের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ হয়েছে। তফসীরে বয়যাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে রূহুল-মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে যেহেতু সন্দেহজনক ক্ষেত্রে দোয়া করা নিষিদ্ধ হয়েছে, কাজেই জেনে-শুনে অন্যায় ও অবৈধ কাজের পক্ষে দোয়া করা অধিকতর হারাম।

এতদ্বারা আরো জানা গেল যে, বর্তমানে অনেক পীর-বুযুর্গানের নীতি হচ্ছে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন দোয়ার জন্য তাঁদের কাছে আসে, পীর-বুযুর্গান তাদের জন্যই হাত তোলেন, মকসুদ হাসিলের দোয়া করেন। অথচ অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জানা থাকে যে, এ ব্যক্তি যালেম ও অন্যায়কারী, অথবা যে মকসুদের জন্য দোয়া করাচ্ছে তা তার জন্য হালাল নয়। এমন কোন চাকরী বা পদ লাভের জন্য দোয়া চায়, যার ফলে সে হারামে লিপ্ত হবে। অথবা কারো হক নষ্ট করে নিজে লাভবান হবে। জেনে শুনে এসব দোয়া করা তো হারাম বটেই, এমনকি সন্দেহজনক ব্যাপারেও প্রকৃত অবস্থা না জেনে দোয়ার জন্য হাত তোলাও সমীচীন নয়।

মুমিন ও কাফেরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব হতে পারে না ঃ এখানে আরো জানা গেল যে, মুমিন ও কাফেরের মধ্যে যতই নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক থাক না কেন, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উক্ত আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করা যাবে না। কোন ব্যক্তি যতই সম্ভ্রান্ত বংশীয় হোক না কেন, যতই বড় বুযুর্গের সন্তান হোক না কেন, এমনকি সৈয়দ বংশীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করুক না কেন,কিন্তু যদি সে ঈমানদার না হয়, তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে তার আভিজাত্য ও নবীর নিকটাত্মীয় হওয়ার কোন মূল্য নেই।। ঈমান, তাকওয়া ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে। যার মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ হয়েছে সে পর হলেও আপনজন। অন্যথায় আপন আত্মীয় হলেও সে পর।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও যদি আত্মীয়তার লক্ষ্য রাখা হতো, তাহলে ভাইয়ের উপর ভাই কখনো তলোয়ার চালাতো না। বদর, ওহুদ ও আহযাবের লড়াই তো একই বংশের লোকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। যাতে করে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয়তা বংশ,বর্ণ,ভাষা বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে না, বরং ঈমান, তাকওয়া ও সৎকর্মশীলতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে। তারা যে কোন বংশের, যে কোন গোত্রের, যে কোন বর্ণের, যে কোন দেশের, যে কোন ভাষাভাষী হোক না কেন, সবাই মিলে এক জাতি, একই ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 'সকল মুসলমান ভাই-ভাই' আয়াতের এটাই মর্মকথা। অপরদিকে যারা ঈমান ও সৎকর্মশীলতা হতে বঞ্চিত, তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সদস্য নয়।

সূরা হুদের ৫০ হতে ৬০ পর্যন্ত ১১ আয়াতে বিশিষ্ট পয়গম্বর হযরত হুদ (আঃ)- এর আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর নামেই অত্র সূরার নামকরণ হয়েছে। অত্র সূরার মধ্যে হযরত নূহ (আঃ) হতে হযরত মূসা (আঃ) পর্যন্ত সাত জন আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) ও তদীয় উম্মতগণের কাহিনী কোরআন পাকের বিশেষ বাচনভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যার মধ্যে উপদেশ ও শিক্ষামূলক এমন তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে, যা যে কোন অনুভূতিশীল মানুষের অন্তরে ভাবান্তর সৃষ্টি না করে পারে না। তাছাড়া ঈমান ও সৎকর্মের বহু মূলনীতি এবং উত্তম পথনির্দেশ রয়েছে।

যদিও অত্র সূরার মধ্যে সাত জন পয়গম্বরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সূরার নামকরণ করা হয়েছে হযরত হুদ (আঃ)-এর নামে। যাতে বোঝা যায় যে, এখানে হুযরত হুদ-এর ঘটনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ পাক হযরত হুদ (আঃ)-কে আদ জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। দৈহিক আকার-আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে 'আদ জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। হযরত হুদ (আঃ)- ও উক্ত জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন— أَخَاهُمْ هُودًا 'তাদের ভাই হুদ'—শব্দে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এত বড় বীর ও শক্তিশালী জাতি তাদের বিবেক ও চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। নিজেদের হাতে তৈরী প্রস্তরমূর্তিকে তারা তাঁদের মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল।

হযরত হুদ (আঃ) তাঁর কওমের নিকট যে দ্বীনী দাওয়াত পেশ করেন, তার তিনটি মূলকথা ৫০, ৫১, ও ৫২ এই তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমতঃ— তওহীদ বা একত্ববাদের আহবান এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্তা বা শক্তিকে এবাদত উপাসনার যোগ্য মনে করা বাতুলতা মাত্র। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি যে তওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছি, এজন্য জীবন উৎসর্গ করছি। তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি এহেন কষ্ট-ক্লেশের পথ কোন্ স্বার্থে অবলম্বন করেছি? আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার বস্তুগত কোন ফায়দা বা স্বার্থ হাসিল হচ্ছে না। এটা যদি আল্লাহ্র নির্দেশ এবং আমার দায়িত্ব না হতো, তাহলে তোমাদেরকে দাওয়াত দিতে ও সংশোধন করতে গিয়ে এত কষ্ট-ক্লেশ বরণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

ওয়াজ নছিহত ও দ্বীনী দাওয়াতের পারিশ্রমিকঃ কোরআন করীমে প্রায় নবী (আঃ)-গণের যবানীতে এ উক্তি ব্যক্ত হয়েছে যে, "আল্লাহ্র দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না।" এতে বোঝা যায় যে, দ্বীনী-দাওয়াত ও তবলীগের কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হলে তা ফলপ্রসু হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয় যে, যারা ওয়াজ-নসিহত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, তাদের কথায় শ্রোতাদের অন্তরে কোন তাসীর করতে পারে না।

তৃতীয়তঃ কথা হচ্ছে, নিজেদের অতীত জীবনে কুফরী, শেরেকী ইত্যাদি যত গোনাহ করেছ, সেসব থেকে আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য ঐসব গোনাহ হতে তওবা কর। অর্থাৎ, দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা কর যে, আগামীতে আর কখনো এসবের ধারে-কাছেও যাবো না। যদি তোমরা এরূপ সত্যিকার তওবা ও এস্তেগফার করতে পার, (তবে তার বদৌলতে পরকালের চিরস্থায়ী সাফল্য ও সুখময় জীবন তো লাভ করবেই,) অধিকন্তু দুনিয়াতেও ইহার বহু উপকারিতা দেখতে পাবে। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটবে, যথাসময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যার ফলে তোমাদের আহার্য-পানীয়ের প্রাচুর্য হবে, তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য বর্ধিত হবে।

এখানে 'শক্তি' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে দৈহিক শক্তি এবং ধন-বল ও জনবল সবই অন্তর্ভুক্ত। এতদ্বারা জানা গেল যে, তওবা ও এস্তেগফারের বদৌলতে ইহজীবনেও ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদির মধ্যে বরকত হয়ে থাকে।

হযরত হুদ (আঃ)-এর আহবানের জবাবে তাঁর দেশবাসী মূর্খতাসুলভ উত্তর দিল যে, আপনি তো আমাদেরকে কোন মু'জেযা দেখালেন না। শুধু মুখের কথায় আমরা নিজেদের বাপ-দাদার আমলের উপাস্য দেব-দেবীগুলোকে বর্জন করবো না। এবং আপনার প্রতি ঈমানও আনব না। বরং আমরা সন্দেহ করছি যে,আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে। তাই আপনি এমন অসংলগ্ন কথা বলছেন।

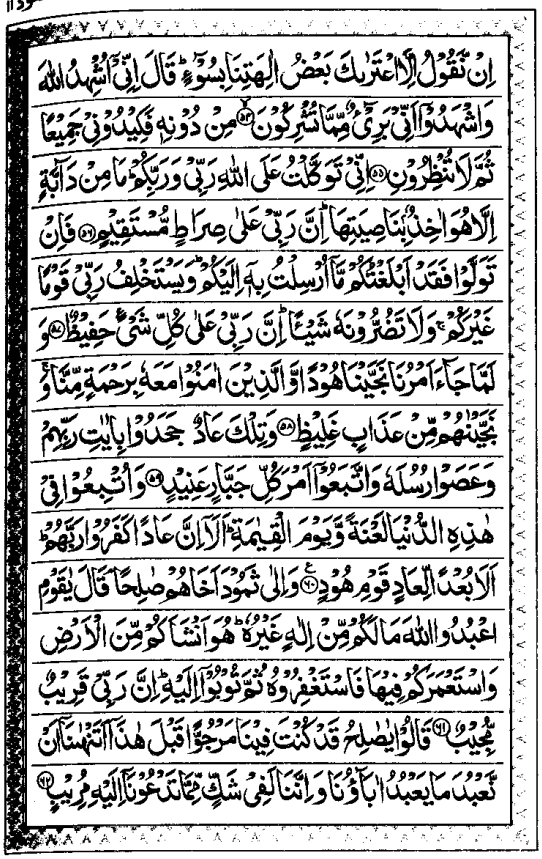

إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۗ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ
وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا
ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ
إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِن
تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا
غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾ وَ
لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ
نَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾ وَأُتْبِعُوا فِي
هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ
أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ
مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا ۖ أَتَنْهَانَا أَن
نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

(৫৪) বরং আমরা তো বলি যে, আমাদের কোন দেবতা তোমার উপরে শোচনীয় ভূত চাপিয়ে দিয়েছে। হুদ বললেন—আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী করেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন সম্পর্ক নাই তাঁদের সাথে যাদেরকে তোমরা শরিক করছ; (৫৫) তাকে ছাড়া, তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অতঃপর আমাকে কোন অবকাশ দিও না। (৫৬) আমি আল্লাহ্র উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই। (৫৭) তথাপি যদি তোমরা মুখ ফেরাও, তবে আমি তোমাদেরকে তা পৌছিয়েছি যা আমার কাছে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে; আর আমার পালনকর্তা অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুই বিগড়াতে পারবে না; নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগারই প্রতিটি বস্তুর হেফাজতকারী। (৫৮) আর আমার আদেশ যখন উপস্থিত হল, তখন আমি নিজ রহমতে হুদ এবং তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে পরিত্রাণ করি এবং তাদেরকে এক কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করি। (৫৯) এ ছিল 'আদ জাতি, যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতকে অমান্য করেছে, আর তদীয় রসূলগণের অবাধ্যতা করেছে এবং প্রত্যেক উদ্ধত বিরোধীদের আদেশ পালন করেছে। (৬০) এ দুনিয়ায় তাদের পিছনে পিছনে লা'নত রয়েছে এবং কেয়ামতের দিনেও; জেনে রাখ, 'আদ জাতি তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে, হুদের জাতি 'আদ জাতির প্রতি অভিসম্পাত রয়েছে জেনে রাখ। (৬১) আর সামূদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করি; তিনি বললেন—হে আমার জাতি! আল্লাহ্র বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নাই। তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অতএব; তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে চল। আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন; সন্দেহ নেই। (৬২) তারা বলল—হে সালেহ, ইতিপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যা পূজা করত তুমি কি আমাদেরকে তার পূজা করতে নিষেধ কর? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদের আহবান জানাচ্ছ আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তদুত্তরে হযরত হুদ (আঃ) পয়গম্বরসুলভ নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, তোমরা যদি আমার কথা না মান, তবে শোন, আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে বলছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের সব অলীক উপাস্যদের প্রতি আমি রুষ্ট ও বিমুখ। এখন তোমরা ও তোমাদের দেবতারা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের, আমার উপর আক্রমণের চেষ্টা করে দেখ, আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিও না। এত বড় কথা আমি এজন্য বলছি যে, আমি আল্লাহ্ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখি ; যিনি আমার এবং তোমাদের একমাত্র পালনকর্তা। ধরাধামে বিচরণশীল সকল প্রাণীই তাঁর মুঠোর মধ্যে। তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া কেউ কারো কোন ক্ষতি করতে পারে না। নিশ্চয় আমার পরওয়ারদেগার সরল পথে রয়েছেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সরল পথে চলবে, সে আল্লাহ্কে পাবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে সাহায্য করবেন।

সমগ্র জাতির মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে এমন নির্ভীক ঘোষণা ও তাদের দীর্ঘ দিনের লালিত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় আঘাত হানা সত্ত্বেও এত বড় সাহসী ও শক্তিশালী জাতির মধ্যে কেউ তাঁর একটি কেশও স্পর্শ করতে পারল না। বস্তুতঃ এটাও হযরত হুদ (আঃ)-এর একটি মু'জেযা। এর দ্বারা একে তো তাদের এ কথার জবাব দেয়া হয়েছে যে, আপনি কোন মু'জেযা প্রদর্শন করেননি। দ্বিতীয়তঃ তারা যে বলত আমাদের কোন কোন দেবতা আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত করে দিয়েছে তাও বাতিল করা হল। কারণ দেব-দেবীর যদি কোন ক্ষমতা থাকত, তবে এত বড় কথা বলার পর ওরা তাঁকে জীবিত রাখত না।

অতঃপর তিনি বলেন,—তোমরা যদি এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে থাক, তবে জেনে রাখ, যে পয়গাম পৌছাবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের নিকট পৌছিয়েছি। অতএব তোমাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহ্র আযাব ও গযব আপতিত হবে, তোমরা সমূলে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর আমার পরওয়ারদেগার তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে এ পৃথিবীতে আবাদ করাবেন। তোমরা যা করছ তাতে তোমাদেরই সর্বনাশ করছ, আল্লাহ্ তাআলার কোন ক্ষতি করছ না। আমার পালনকর্তা সবকিছু লক্ষ্য রাখেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তোমাদের সব ধ্যান-ধারণা ও কার্য-কলাপের তিনি খবর রাখেন।

কিন্তু হতভাগার দল হযরত হুদ (আঃ)-এর কোন কথায় কর্ণপাত করল না। তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর অবিচল রইল। অবশেষে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান রূপে আল্লাহ্র আযাব নেমে এল। সাত দিন আট রাত যাবত অনবরত ঝড় তুফান বইতে লাগল। বাড়ী-ঘর ধ্বসে গেল, গাছ-পালা উপড়ে পড়ল, গৃহ-ছাদ উড়ে গেল, মানুষ ও সকল জীবজন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে যমীনে নিক্ষিপ্ত হল, এভাবেই সুঠাম দেহের অধিকারী শক্তিশালী একটি জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল।

'আদ জাতির উপর যখন প্রতিশ্রুত আযাব নাযিল হয়, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুযায়ী হযরত হুদ (আঃ) ও সঙ্গী ঈমানদারগণকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আযাব হতে রক্ষা করেন।

'আদ জাতির কাহিনী ও আযাবের ঘটনা বর্ণনা করার পর অপরাপর লোকদের শিক্ষা ও সতর্কীকরণের জন্য এরশাদ করেছেন যে, কওমে আদ আল্লাহ্র আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ্র

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ
رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ
تَخْسِيْرٍ ﴿٦٣﴾ وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ
اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٤﴾
فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ
مَكْذُوْبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ
بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿٦٦﴾
وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٦٧﴾
كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَا۟ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ اَلَا بُعْدًا
لِّثَمُوْدَ ﴿٦٨﴾ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا
قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَآٰ اَيْدِيَهُمْ
لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّآ
اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٠﴾ وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا
بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ
وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾

(৬৩) সালেহ বললেন—হে আমার জাতি! তোমরা কি মনে কর, আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে বুদ্ধি-বিবেচনা লাভ করে থাকি আর তিনি যদি আমাকে নিজের তরফ হতে রহমত দান করে থাকেন, অতঃপর আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই তবে তার থেকে কে আমায় রক্ষা করবে? তোমরা তো আমার ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করতে পারবে না। (৬৪) আর হে আমার জাতি! আল্লাহ্‌র এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব তাকে আল্লাহ্‌র যমীনে বিচরণ করে খেতে দাও, এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করবে না। নতুবা অতি সত্বর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে। (৬৫) তবু তারা উহার পা কেটে দিল। তখন সালেহ বললেন—তোমরা নিজেদের গৃহে তিনটি দিন উপভোগ করে নাও। ইহা এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না। (৬৬) অতঃপর আমার আযাব যখন উপস্থিত হল, তখন আমি সালেহকে ও তদীয় সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে উদ্ধার করি, এবং সেদিনকার অপমান হতে রক্ষা করি। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা তিনিই সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী। (৬৭) আর ভয়ঙ্কর গর্জন পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করল, ফলে ভোর হতে না হতেই তারা নিজ নিজ গৃহসমূহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৬৮) যেন তাঁরা কোনদিনই সেখানে ছিল না। জেনে রাখ, নিশ্চয় সামূদ জাতি তাদের পালনকর্তার প্রতি অস্বীকার করেছিল। আরো শুনে রাখ, সামূদ জাতির জন্য অভিশাপ রয়েছে। (৬৯) আর অবশ্যই আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ইব্রাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল তারা বলল— সালাম, তিনিও বললেন— সালাম। অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে এলেন। (৭০) কিন্তু যখন দেখলেন যে, আহার্যের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি সন্ধিগ্ধ হলেন এবং মনে মনে তাঁদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগলেন। তারা বলল—ভয় পাবেন না। আমরা লূতের কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৭১) তাঁর স্ত্রীও নিকটেই দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল। অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরের ইয়াকুবেরও। (৭২) সে বলল-কি দুর্ভাগ্য আমার। আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এতো ভারী আশ্চর্য কথা!

রসূলগণকে আমান্য করেছে, হঠকারী পাপিষ্ঠদের কথামত কাজ করেছে। যার ফলে দুনিয়াতে তাদের প্রতি গযব নাযিল হয়েছে এবং আখেরাতেও অভিশপ্ত আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে।

এখানে বোঝা যায় যে, 'আদ জাতি ঝড়-তুফানের কবলে পতিত হয়েছিল। কিন্তু 'সূরা মুমিনুন'-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, হয়ত উভয় প্রকার আযাবই নাযিল হয়েছিল। প্রথমে ঝড় তুফান শুরু হয়েছিল, চরম পর্যায়ে ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছিল।

৬১ থেকে ৬৮ পর্যন্ত ৮ আয়াতে হযরত সালেহ (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যিনি 'আদ জাতির দ্বিতীয় শাখা 'কওমে সামূদ' -এর প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনিও তাঁর কওমকে সর্বপ্রথম তওহীদের দাওয়াত দিলেন। দেশবাসী তা প্রত্যাখ্যান করে বলল—"এ পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ড থেকে আমাদের সম্মুখে আপনি যদি একটি উষ্ট্রী বের করে দেখাতে পারেন, তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মানতে রাজী আছি।"

হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, তোমাদের চাহিদা মোতাবেক মু'জেযা প্রদর্শনের পরেও তোমরা যদি ঈমান আনতে দ্বিধা প্রকাশ কর, তাহলে কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার বিধান অনুসারে তোমাদের উপর আযাব নেমে আসবে, তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদের হঠকারিতা থেকে বিরত হল না। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অসীম কুদরতে তাদের চাহিদা মোতাবেক মু'জেযা জাহির করলেন। বিশাল প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ হয়ে তাদের কথিত গুণাবলী সম্পন্ন উষ্ট্রী আত্ম-প্রকাশ করল। আল্লাহ্ তাআলা হুকুম দিলেন যে, এ উষ্ট্রীকে কেউ যেন কোনরূপ কষ্ট-ক্লেশ না দেয়। যদি এরূপ করা হয় তবে তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল হয়ে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করল, উষ্ট্রীকে হত্যা করল। তখন আল্লাহ্ তাআলা কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। হযরত সালেহ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণ নিরাপদে রক্ষা পেলেন। অন্য সবাই এক ভয়াবহ গর্জনে ধ্বংস হল। অত্র ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত সালেহ (আঃ)-এর জাতি তাঁকে বলল

قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ অর্থাৎ, "তওহীদের দাওয়াত ও প্রতিমা পূজা থেকে আমাদের বারণ করার আগ পর্যন্ত আপনার সম্পর্কে আমরা উচ্চাশা পোষণ করতাম যে, আপনি আগামীতে আমাদের নেতৃত্ব দান করবেন।" এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলা বাল্যকাল হতেই নবীগণকে যোগ্যতা ও উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী করে থাকেন। যার ফলে সবাই তাঁদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হতো। যেমন হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নবুওয়ত ঘোষণা করার পূর্বে সমগ্র আরববাসী তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী মনে করত, এবং 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কিন্তু নবুওয়তের দাবী ও মূর্তি পূজা থেকে বারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেসব লোক তাঁর বিরোধিতা ও শত্রুতা শুরু করেছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ অর্থাৎ, তারা যখন আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে অলৌকিক উষ্ট্রীকে হত্যা করল, তখন তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হল যে, মাত্র তিন দিন তোমাদিগকে অবকাশ দেয়া হল, এ তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ অবকাশের তিন দিন ছিল

বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। রবিবার প্রত্যুষে তাদের উপর আযাব নাযিল হল।

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ অর্থাৎ, ঐ পাপিষ্ঠদেরকে এক ভয়ঙ্কর গর্জন এসে পাকড়াও করল। এ ছিল হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর গর্জন, যা হাজার হাজার বজ্রধ্বনির সম্মিলিত শক্তির চেয়েও ভয়াবহ। যা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষ বা কোন জীবজন্তুর হতে পারে না। এরূপ প্রাণ কাঁপানো গর্জনেই সকলে মৃত্যুবরণ করেছিল।

অত্র আয়াতের মর্মার্থ থেকে বোঝা যায় যে, 'কওমে-সামূদ' ভয়ঙ্কর গর্জনে ধ্বংস হয়েছিল। অপর দিকে সূরা আ'রাফ'-এর এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে- فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ 'অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল।' এতে বোঝা যায় যে, ভূমিকম্পের ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, উভয় আয়াতের মর্মার্থে কোন বিরোধ নেই। হয়ত প্রথমে ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল। এবং তৎসঙ্গেই ভয়ঙ্কর গর্জনে সবাই ধ্বংস হয়েছিল।

এখানে হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ (আঃ)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সন্তান লাভের সু-সংবাদ দেয়ার জন্য তাঁর কাছে কতিপয় ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছিলেন। কেননা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) -এর স্ত্রী বিবি সারা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি সন্তানের জন্য একান্ত উদগ্রীব ছিলেন; কিন্তু উভয়ের বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হওয়ার কারণে দৃশ্যতঃ সন্তান লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতার মাধ্যমে সুসংবাদ দান করলেন যে, তাঁরা অচিরেই একটি পুত্রসন্তান লাভ করবেন। তাঁর নামকরণ করা হল ইসহাক। আরো অবহিত করা হল যে, হযরত ইসহাক (আঃ) দীর্ঘ জীবী হবেন, সন্তান লাভ করবেন, তাঁর সন্তানের নাম হবে 'ইয়াকুব' (আঃ)। উভয়ে নবুওয়তের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

ফেরেশতাগণ মানবাকৃতিতে আগমন করায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদেরকে সাধারণ আগন্তুক মনে করে মেহমানদারীর আয়োজন করেন। ভুনা গোশ্ত সামনে রাখলেন। কিন্তু তারা ছিলেন ফেরেশতা, পানাহারের উর্ধ্বে। কাজেই সম্মুখে আহার্য দেখেও তারা সেদিকে হাত বাড়ালেন না। এটা লক্ষ্য করে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আতঙ্কিত হলেন যে, হয়ত এদের মনে কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে। ফেরেশতাগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অমূলক আশঙ্কা আন্দাজ করে উহা দূর করার জন্য স্পষ্টভাবে জানালেন যে, "আপনি শঙ্কিত হবেন না। আমরা আল্লাহ্র ফেরেশতা, আপনাকে একটি সুসংবাদ দান করা ও অন্য একটি বিশেষ কার্য সম্পাদানের জন্য আমরা প্রেরিত হয়েছি। তা হচ্ছে হযরত লূত (আঃ)-এর কওমের উপর আযাব নাযিল করা।" হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি সারা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন যে, এরা মানুষ নন, ফেরেশতা; তখন পর্দার প্রয়োজন রইল না। বৃদ্ধকালে সন্তান লাভের সু-খবর শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন, এহেন বৃদ্ধ বয়সে আমার গর্ভে সন্তান জন্ম হবে! আর আমার এ স্বামীও তো অতি বৃদ্ধ। ফেরেশতাগণ উত্তর দিলেন, তুমি কি আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করছ? যাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। বিশেষ করে তোমরা নবী পরিবারের লোক। তোমাদের পরিবারের উপর আল্লাহ্ তাআলার প্রভূত রহমত এবং অফুরন্ত বরকত রয়েছে। বাহ্যিক কার্য-কারণের উর্ধ্বে বহু অলৌকিক ঘটনাবলী তোমরা নিজ চোখে অবলোকন করছ। তা সত্ত্বেও বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ আছে কি? এ হচ্ছে ঘটনার সংক্ষিপ্তসার। এবার আয়াতসমূহের বিস্তারিত আলোচনায় আসা যাক।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট কোন সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। এই সুসংবাদের বিবরণ সামনের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—ফেরেশতার দলে হযরত জিবরাঈল (আঃ), হযরত মীকাঈল (আঃ) ও ইস্রাফীল (আঃ) এ তিন জন ফেরেশতা ছিলেন।- (কুরতুবী) তাঁরা মানবাকৃতিতে আগমন করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে সালাম করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যথারীতি সালামের জবাব দিলেন এবং তাদেরকে মানুষ মনে করে আতিথেয়তার আয়োজন করলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মেহমানদারীর প্রথা প্রবর্তন করেন।- (কুরতুবী) তাঁর নিয়ম ছিল যে, মেহমান ছাড়া একাকী কখনো খানা খেতেন না। খাবার সময় খোঁজ করে মেহমান নিয়ে এসে সাথে খেতে বসতেন।

তফসীরে কুরতুবীতে ইস্রাঈলী সূত্র উদ্ধৃত করে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একদিন তাঁর সাথে খানা খাওয়ার জন্য মেহমান তালাশ করছিলেন। এমন সময় জনৈক অচেনা লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। যখন খানা খেতে শুরু করবেন, তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আগন্তুক মুসাফিরকে বললেন—"বিসমিল্লাহ্ -আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি বল।" সে বলল—"আল্লাহ্ কাকে বলে আমি জানি না।" হযরত ইবরাহীম (আঃ) রাগান্বিত হয়ে তাকে দস্তরখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। যখন সে বের হয়ে গেল, তৎক্ষণাত হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপস্থিত হলেন এবং জানালেন যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন-আমি তার কুফরী সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সারা জীবন তাকে আহার্য-পানীয় দিয়ে আসছি। আর আপনি একে এক বেলা খাবার দিতে পারলেন না। একথা শোনা মাত্র হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ঐ লোকটির তালাশে ছুটলেন। অবশেষে তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি বেঁকে বসল এবং বলল, "আপনি প্রথমে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, পরে আবার সাধাসাধি করে আনতে গেলেন কেন? এ কারণ না জানা পর্যন্ত আমি খাদ্য স্পর্শ করব না।"

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করলেন। কাফের লোকটির মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হল। সে বলল— যে মহান পালনকর্তা ফেরেশতা প্রেরণ করে আপনাকে একথা জানিয়েছেন, তিনি সত্যই পরম দয়ালু। আমি তার প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর সে বিসমিল্লাহ বলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে খানা খেতে আরম্ভ করল।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর আতিথেয়তার অভ্যাস অনুযায়ী আগন্তুক ফেরেশতাগণকে মানুষ মনে করে অনতিবিলম্বে একটি বাছুর গরু জবেহ করলেন এবং উহা ভুনা করে মেহমান ফেরেশতাগণের আহারের জন্য তাদের সামনে রাখলেন।

৭০ তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, আগন্তুক ফেরেশতাগণ যদিও মানবাকৃতিতে আগমন করেছিলেন এবং মানবসুলভ পানাহারের বৈশিষ্ট্য তাদেরকে দান করা যদিও সম্ভব ছিল। কিন্তু পানাহার না করার মধ্যেই হেকমত নিহিত ছিল, যেন তাঁদের ফেরেশতা হওয়া প্রকাশ পায়। কাজেই মানবাকৃতি সত্ত্বেও তাঁদের পানাহার না করায় 'ফেরেশতা স্বভাব' বজায় রাখা হয়েছিল। যার ফলে তাঁরা আহার্যের দিকে হাত বাড়ান নাই।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ফেরেশতাদের হাতে কিছু তীর

قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ
الْبَيْتِ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿٧٣﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ
وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٤﴾ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ
لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿٧٥﴾ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ
جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿٧٦﴾ وَلَمَّا
جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا
يَوْمٌ عَصِيْبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ۗ وَمِنْ قَبْلُ
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۗ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ
لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ۗ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ
رَّشِيْدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ
وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ
اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ
لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا
يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ۗ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ۗ
اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۗ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ﴿٨١﴾

(৭৩) তারা বলল—তুমি আল্লাহ্‌র হুকুম সম্পর্কে বিস্ময়বোধ করছ? হে গৃহবাসীরা, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত ও প্রভূত বরকত রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রশংসিত মহিমায়। (৭৪) অতঃপর যখন ইব্রাহীম (আঃ)-এর আতঙ্ক দূর হল এবং তিনি সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি আমার সাথে তর্ক শুরু করলেন কওমে লূত সম্পর্কে। (৭৫) ইব্রাহীম (আঃ) বড়ই ধৈর্যশীল, কোমল অন্তর, আল্লাহ্‌মুখী সন্দেহ নেই। (৭৬) ইব্রাহীম, এহেন ধারণা পরিহার কর; তোমার পালনকর্তার হুকুম এসে গেছে, এবং তাদের উপর সে আযাব অবশ্যই আপতিত হবে, যা কখনো প্রতিহত হবার নয়। (৭৭) আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত হল। তখন তাঁদের আগমনে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন এবং তিনি বলতে লাগলেন—আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। (৭৮) আর তাঁর কওমের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর (গৃহ) পানে ছুটে আসতে লাগল। পূর্ব থেকেই তারা কু-কর্মে তৎপর ছিল। লূত (আঃ) বললেন—'হে আমার কওম, এ আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতমা। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না, তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই। (৭৯) তারা বলল—তুমি তো জানই, তোমার কন্যাদের নিয়ে আমাদের কোন গরজ নেই। আর আমরা কি চাই, তাও তুমি অবশ্যই জান। (৮০) লূত (আঃ) বললেন—হায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম। (৮১) মেহমান ফেরেশতাগণ বলল—হে লূত (আঃ) আমরা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে প্রেরিত পেরেশতা। এরা কখনো তোমার দিকে পৌঁছতে পারবে না। ব্যস তুমি কিছুটা রাত থাকতে থাকতে নিজের লোকজন নিয়ে বাইরে চলে যাও। আর তোমাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রী নিশ্চয় তার উপরও তা আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। ভোর বেলাই তাদের প্রতিশ্রুতির সময়, ভোর কি খুব নিকটে নয়?

ছিল। তাঁরা উহার ফলক দ্বারা ভুনা গোশত স্পর্শ করছিলেন। তাঁদের এহেন আচরণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত হলেন। কারণ, সে দেশে নিয়ম ছিল যে, অসদুদ্দেশে কেউ কারো বাড়ীতে মেহমান হলে সেখানে পানাহার করত না।–(তফসীরে কুরতুবী) অবশেষে ফেরেশতারা প্রকাশ করে দিলেন যে, আপনি ভীত হবেন না। আমরা মানুষই নই, বরং আল্লাহ্‌র ফেরেশতা।

আহ্কাম ও মাসায়েল

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামী আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত দেয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তদীয় তফসীরে যার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

সালামের সুন্নত ঃ قَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ "তাঁরা সালাম বললেন, তিনিও বললেন সালাম।" এতদ্বারা বোঝা যায় যে, মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ-মোলাকাতের সময় পরস্পরকে সালাম করা কর্তব্য। আরো জানা গেল যে, আগন্তুক ব্যক্তি প্রথমে সালাম করবে, অন্যরা তার জবাব দেবে—এটাই বাঞ্ছনীয়।

পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎকালে বিশেষ কোন বাক্য উচ্চারণ করে একে অপরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার রীতি পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। তবে এ ব্যাপারেও ইসলামের শিক্ষা অনন্য ও সর্বোত্তম। কেননা সালামের সুন্নত সম্মত বাক্য السلام عليكم -এর মধ্যে সর্বপ্রথম 'আস-সালামু' আল্লাহ্‌র একটি গুণ বাচক নাম হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র যিকর করা হল, সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য সালামতি ও নিরাপত্তার দোয়া করা হল, নিজের পক্ষ হতে তার জান-মাল ইজ্জতের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হল।

এখানে কোরআন পাকে ফেরেশতাদের পক্ষ হতে سَلٰمًا 'সালামান' এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর তরফ হতে শুধু سَلٰمٌ 'সালামুন্' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে সালাম ও জবাবের পূর্ণ বাক্য উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। কার্যতঃ অবশ্য এখানে উভয়ক্ষেত্রে সুন্নত মোতাবেক সালাম জবাবের পূর্ণ বাক্যই বোঝানো হয়েছে। হযরত রসূলে করীম (সাঃ)ও নিজের আচরণের মাধ্যমে সালামের পূর্ণ বাক্য শিক্ষা দান করেছেন। অর্থাৎ, প্রথম পক্ষ আস-সালামু আলাইকুম বলবে, তদুত্তরে দ্বিতীয় পক্ষ 'ওয়া-আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমতুল্লাহ' বলবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হুদে পূর্ববর্তী অধিকাংশ আম্বিয়ারে কেরাম (আঃ) ও তাঁদের উম্মতগণের কাহিনী ও নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আসমানী আযাব অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত লূত (আঃ) ও তাঁর দেশবাসীর অবস্থা ও দেশবাসীর উপর কঠিন আযাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

হযরত লূত (আঃ)-এর কওম একে তো কাফের ছিল, অধিকন্তু তারা এমন এক জঘন্য অপকর্ম ও লজ্জাকর অনাচারে লিপ্ত ছিল, যা পূর্ববর্তী কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায় নাই, বন্য পশুরাও যা ঘৃণা করে থাকে। অর্থাৎ, পুরুষ কর্তৃক অন্য পুরুষের সাথে মৈথুন করা। ব্যভিচারের চেয়েও ইহা জঘন্য অপরাধ। এ জন্যই তাদের উপর এমন কঠিন আযাব অবতীর্ণ হয়েছে, যা অন্য কোন অপকর্মকারীদের উপর কখনো অবতীর্ণ হয় নাই।

হযরত লূত (আঃ)–এর ঘটনা যা অত্র আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সহ কতিপয় ফেরেশতাকে কওমে লূতের উপর আযাব নাযিল করার জন্য প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে তাঁরা ফিলিস্তীনে প্রথমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর সমীপে উপস্থিত হন।

আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন জাতিকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করেন, তখন তাদের কার্যকলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আযাবই নাযিল করে থাকে। এ ক্ষেত্রেও ফেরেশতাগণকে নওজোয়ানরূপে প্রেরণ করেন। হযরত লূত (আঃ) ও তাঁদেরকে মানুষ মনে করে তাদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ মেহমানের আতিথেয়তা নবীর নৈতিক দায়িত্ব। পক্ষান্তরে দেশবাসীর কু-স্বভাব তাঁর অজানা ছিল না। উভয় সংকটে পড়ে তিনি স্বগতোক্তি করলেন— "আজকের দিনটি বড় সংকটময় দিন।"

আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এ দুনিয়াকে আজব শিক্ষাক্ষেত্র বানিয়েছেন। যার মধ্যে তাঁর অসীম কুদরত ও অফুরন্ত হেকমতের ভূরি ভূরি নিদর্শন রয়েছে। মূর্তিপূজারী আযরের গৃহে আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ)–কে পয়দা করেছেন। হযরত লূত (আঃ)–এর মত একজন বিশিষ্ট পয়গম্বরের স্ত্রী নবীর বিরুদ্ধাচরণ করে কাফেরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত। সম্মানিত ফেরেশতাগণ সুদর্শন নওজোয়ান আকৃতিতে যখন হযরত লূত (আঃ)–এর গৃহে উপনীত হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী সমাজের দুষ্ট লোকদেরকে খবর দিল যে, আজ আমাদের গৃহে এরূপ মেহমান আগমন করেছেন।—(কুরতুবী ও মাযহারী)

হযরত লূত (আঃ)–এর আশঙ্কা যথার্থ প্রমাণিত হল। যার বর্ণনা ৭৮ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ "আর তাঁর কওমের লোকেরা আত্মহারা হয়ে তাঁর গৃহপানে ছুটে এল। আর আগে থেকেই তারা কু-কর্মে অভ্যস্থ ছিল।"

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জঘন্য কু-কর্মের প্রভাবে তারা এতদূর চরম নির্লজ্জ হয়েছিল যে, হযরত লূত (আঃ)–এর মত একজন সম্মানিত পয়গম্বরের গৃহ প্রকাশ্যভাবে অবরোধ করেছিল।

হযরত লূত (আঃ) যখন দেখলেন যে, তাদেরকে প্রতিরোধ করা দুষ্কর, তখন তাদেরকে দুষ্কৃতি হতে বিরত রাখার জন্য তাদের সর্দারদের নিকট স্বীয় কন্যাদের বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। তৎকালে কাফের পাত্রের সাথে মুসলিম পাত্রীর বিবাহ-বন্ধন বৈধ ছিল। হুযুরে আকরাম (সাঃ)–এর প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত এ হুকুম বহাল ছিল। এ জন্যই হযরত (সাঃ) স্বীয় দুই কন্যাকে প্রথমে উতবা ইবনে আবু লাহাব ও আবুল আস ইবনে রবী'র কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। অথচ তখন তারা উভয়ে কুফরী হালতে ছিল। পরবর্তীকালে ওহীর মাধ্যমে কাফেরের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ হারাম ঘোষণা হয়।—(কুরতুবী)

কোন কোন তফসীরকারের মতে– এখানে হযরত লূত (আঃ) নিজের কন্যা দ্বারা সমগ্র জাতির বধূ কন্যাদের বুঝিয়েছেন। কেননা, প্রত্যেক নবী নিজ উম্মতের জন্য পিতৃতুল্য এবং উম্মতগণ তাঁর রূহানী সন্তানস্বরূপ। যেমন কোরআনের ২১ পারা সূরা আহযাবের ৬ষ্ঠ আয়াত اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ এর সাথে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)–এর ক্বেরাতে وهواب لهم বাক্যেও বর্ণিত আছে। যার মধ্যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)–কে সমগ্র ''উম্মতের পিতা'' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অত্র তফসীর অনুসারে হযরত লূত (আঃ)–এর কথার অর্থ হল, তোমরা নিজের কদাচার হতে বিরত হও এবং ভদ্রভাবে কওমের কন্যাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে বৈধভাবে স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর।

অতঃপর হযরত লূত (আঃ) তাদেরকে আল্লাহ্র আযাবের ভীতি প্রদর্শন করে বললেন فَاتَّقُوا اللّٰهَ "আল্লাহ্কে ভয় কর" এবং কাকুতি-মিনতি করে বললেন— وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ "আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করো না।" তিনি আরো বললেন – اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ "তোমাদের মাঝে কি কোন ন্যায়নিষ্ঠ ভাল মানুষ নেই? আমার আকুল আবেদনে যার অন্তরে এতটুকু করুণার সৃষ্টি হবে।

কিন্তু তাদের মধ্যে শালীনতা ও মনুষ্যত্বের লেশমাত্র ছিল না। তারা একযোগে বলে উঠল— "আপনি তো জানেনই যে, আপনার বধূ-কন্যাদের প্রতি আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আর আমরা কি চাই, তাও আপনি অবশ্যই জানেন।"

লূত (আঃ) এক সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন— হায়, আমি যদি তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হতাম, অথবা আমার আত্মীয়-স্বজন যদি এখানে থাকত, যারা এই জালেমদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতো, তাহলে কত ভালো হতো।

ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আঃ)–এর অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে প্রকৃত রহস্য ব্যক্ত করলেন এবং বললেন—আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনার দলই সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। আমরা মানুষ নই, বরং আল্লাহ্র প্রেরিত ফেরেশতা। তারা আমাদেরকে কাবু করতে পারবে না বরং আযাব নাযিল করে দুরাত্মা-দুরাচারদের নিপাত সাধনের জন্যই আমরা আগমন করেছি।

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা হযরত লূত (আঃ)–এর উপর রহম করুন, তিনি নিরুপায় হয়ে সুদৃঢ় জামাতের আশ্রয় কামনা করেছিলেন।" তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত লূত (আঃ)–এর পরবর্তী প্রত্যেক নবী সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।—(কুরতুবী) স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)–এর বিরুদ্ধে কোরাইশ-কাফেরগণ হাজার রকম অপচেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাঁর হাশেমী গোত্রের লোকেরা সম্মিলিতভাবে তাঁকে আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে, যদিও ধর্ম-মতের দিক দিয়ে তাদের অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করত। এ জন্যই সম্পূর্ণ বনী-হাশেম গোত্র রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সাথে শামিল ছিল। যখন কোরাইশ কাফেররা তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের দানা-পানি বন্ধ করে দিয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দুর্বৃত্তরা যখন হযরত লূত (আঃ)–এর গৃহদ্বারে সমবেত হল, তখন তিনি গৃহদ্বার রুদ্ধ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ গৃহে অবস্থান করছিলেন। আড়াল হতে দুষ্টদের কথাবার্তা চলছিল। তারা দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ এবং কপাট ভাঙ্গতে উদ্যোগী হল। এমন সংগীন মুহূর্তে হযরত লূত (আঃ) পূর্বোক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে অভয় দান করলেন এবং গৃহদ্বার খুলে দিতে বললেন। তিনি দুয়ার খুলে দিলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ওদের প্রতি তাঁর পাখার ঝাপটা দিলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল এবং ভাগতে লাগল।

فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا
حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ۝٨٢ مَّنضُودٍ ۝٨٣ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَ
مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝٨٣ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ
قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا
تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝٨٤ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝٨٥ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۝٨٦ قَالُوا يَا شُعَيْبُ
أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ
فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ۝٨٧ قَالَ
يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ
رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ
عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا
تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝٨٨

(৮২) অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌছল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর-পাথর বর্ষণ করলাম। (৮৩) যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল। আর সেই পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়। (৮৪) আর মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েব (আঃ)-কে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন— হে আমার কওম! আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া আমাদের কোন মাবুদ নাই। আর পরিমাপে ও ওজনে কম দিও না, আজ আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থায়ই দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের উপর এমন একদিনের আযাবের আশঙ্কা করছি যেদিনটি পরিবেষ্টনকারী। (৮৫) আর হে আমার জাতি, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনরূপ ক্ষতি করো না, আর পৃথিবীতে ফাসাদ করে বেড়াবে না। (৮৬) আল্লাহ্ প্রদত্ত উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা ঈমানদার হও, আর আমি তো তোমাদের উপর সদা পর্যবেক্ষণকারী নই। (৮৭) তারা বলল— হে শোয়ায়ের (আঃ), আপনার নামায কি আপনাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খাস মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক। (৮৮) শোয়ায়েব (আঃ) বললেন— হে দেশবাসী, তোমরা কি মনে কর! আমি যদি আমার পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীলের উপর কায়েম থাকি আর তিনি যদি নিজের তরফ হতে আমাকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, (তবে কি আমি তাঁর হুকুম অমান্য করতে পারি?) আর আমি চাই না যে— তোমাদেরকে যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হব, আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আল্লাহ্‌র মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাই।

তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশক্রমে হযরত লূত (আঃ)-কে বললেন— আপনি কিছুটা রাত থাকতে আপনার লোকজনসহ এখান থেকে অন্যত্র সরে যান এবং সবাইকে সতর্ক করে দিন যে, তাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়, তবে আপনার স্ত্রী ব্যতীত। কারণ, অন্যদের উপর যে আযাব আপতিত হবে, তাকেও সে আযাব ভোগ করতে হবে।

ইহার এক অর্থ হতে পারে যে, আপনার স্ত্রীকে সাথে নেবেন না। (দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে, তাকে পিছনে ফিরে চাইতে নিষেধ করবেন না।—(অনুবাদক)। আরেক অর্থ হতে পারে যে, সে আপনার হুশিয়ারী মেনে চলবে না।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর স্ত্রীও সাথে যাচ্ছিল। কিন্তু পাপিষ্ঠদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনাটা শুনে পশ্চাতে ফিরে তাকাল এবং কওমের শোচনীয় পরিণতি দেখে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। তৎক্ষণাৎ একটি প্রস্তরের আঘাতে সেও অক্কা পেল।—(কুরতুবী ও মাযহারী)

ফেরেশতারা আরো জানিয়ে দিলেন যে, إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ প্রত্যূষকালেই তাদের উপর আযাব আপতিত হবে। হযরত লূত (আঃ) বললেন— "আমি চাই, আরো জলদি আযাব আসুক।" ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন ঃ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ "প্রত্যূষকাল দূরে নয়, বরং সমাগত প্রায়।"

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অতঃপর উক্ত আযাবের ধরন সম্পর্কে কোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে—যখন আযাবের হুকুম কার্যকরী করার সময় হল, তখন আমি তাদের বসতির উপরিভাগকে নীচে করে দিলাম এবং তাদের উপর অবিশ্রান্তভাবে এমন পাথর বর্ষণ করলাম, যার প্রত্যেকটি পাথর একজনের নামে চিহ্নিত ছিল।

বর্ণিত আছে যে, চারটি বড় বড় শহরে তাদের বসতি ছিল। ঐসব জনপদকেই কোরআন পাকের অন্য আয়াতে وَالْمُؤْتَفِكَةَ 'মুতাফেকাত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর পাখা উক্ত শহর চতুষ্টয়ের যমীনের তলদেশে প্রবিষ্ট করতঃ এমনভাবে মহাশূন্যে উত্তোলন করলেন যে, সবকিছু নিজ নিজ স্থানে স্থির ছিল। এমনকি পানি ভর্তি পাত্র হতে এক বিন্দু পানিও পড়ল না বা নড়ল না। মহাশূন্য হতে কুকুর জানোয়ার ও মানুষের চিৎকার ভেসে আসছিল। ঐসব জনপদকে সোজাভাবে আকাশের দিকে তুলে উলটিয়ে যথাস্থানে নিক্ষেপ করা হল। তারা আল্লাহ্‌র আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে উলটিয়েছিল, তাই এটা ছিল তাদের উপযুক্ত শাস্তি।

হযরত লূত (আঃ)-এর নাফরমান জাতির শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য এরশাদ হয়েছে —— وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ প্রস্তর বর্ষণের আযাব বর্তমানকালের জালেমদের থেকেও দূরে নয়। বরং কোরাইশ কাফেরদের জন্য ঘটনাস্থল ও ঘটনাকাল খুবই কাছে এবং অন্যান্য পাপিষ্ঠরাও যেন নিজেদেরকে এহেন আযাব হতে দূরে মনে না করে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের কিছু লোক কওমের লূতের অপকর্মে

লিপ্ত হবে। যখন এরূপ হতে দেখবে, তখন তাদের উপরও অনুরূপ আযাব আসার অপেক্ষা কর।"

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) ও তাঁর কওমের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। তারা কুফরী ও শেরেকী ছাড়া ওজনে-পরিমাপেও লোকদের ঠকাতো। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন এবং ওজনে কম-বেশী করতে নিষেধ করলেন। আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও না-ফরমানীর উপর অটল রইল। ফলে এক কঠিন আযাবে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে গেল। وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا 'আর আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইব (আঃ)-কে প্রেরণ করছি।' 'মাদইয়ান' আসলে একটি শহরের নাম। মাদইয়ান ইবনে ইব্রাহীম ইহার পত্তন করেছিলেন। সিরিয়ার বর্তমান معان 'মোয়ান' নামক স্থানে উহা অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। উক্ত শহরের অধিবাসীগণকে মাদইয়ানবাসী বলার পরিবর্তে শুধু "মাদইয়ান" বলা হত। আল্লাহ্ তাআলার বিশিষ্ট পয়গম্বর হযরত শোয়ায়েব (আঃ) উক্ত মাদইয়ান কওমের লোক ছিলেন তাই তাঁকে "তাদের ভাই" বলা হয়েছে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ করে তাদের স্বজাতির এক ব্যক্তিকে তাদের কাছে পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করলেন, যেন তাঁর সাথে জানাশোনা থাকার কারণে সহজেই তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে।

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ "তিনি বললেন— হে আমার জাতি ! তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র এবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের মাবুদ হওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। আর তোমরা ওজনে ও পরিমাপে কম দিও না।" এখানে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) নিজ জাতিকে প্রথমে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানালেন। কেননা, তারা ছিল মুশরেক, গাছপালার পূজা করত। এজন্যই মাদইয়ানবাসীকে 'আসহাবুল-আইকা' বা 'জঙ্গলওয়ালা' উপাধি দেয়া হয়েছে। এহেন কুফরী ও শেরেকীর সাথে সাথে আরেকটি মারাত্মক দোষ ও জঘন্য অপরাধ ছিল যে, আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয় কালে ওজনে-পরিমাপে হের-ফের করে লোকের হক আত্মসাৎ করত। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন।

এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, কুফরী ও শেরেকীই সকল পাপের মূল। যে জাতি ইহাতে লিপ্ত, তাদেরকে প্রথমই তওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়। ঈমান আনয়নের পূর্বে আমল ও কায়-কারবারের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় না। দুনিয়াতে তাদের সফলতা অথবা ব্যর্থতাও শুধু ঈমান বা কুফরীর ভিত্তিতে হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে আমলের কোন দখল থাকে না। কোরআন পাকে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীগণের ও তাঁদের জাতিসমূহের ঘটনাবলী ইহার প্রমাণ। তবে শুধু দুইটি জাতি এমন ছিল, যাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কুফরীর সাথে সাথে তাদের বদ-আমলেরও দখল ছিল। প্রথম, হযরত লূত (আঃ)-এর জাতি যাদের কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের কুফরী ও গর্হিত অপকর্মের কারণে তাদের বসতিকে উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কওম। যাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার জন্য কুফরী ও মাপে কম দেয়াকে কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

এতে করে বোঝা যায় যে, পুংমৈথুন ও মাপে কম দেয়া আল্লাহ্ তাআলার কাছে সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ। কারণ ইহা এমন দু'টি কার্য যার ফলে সমগ্র মানব জাতির চরম সর্বনাশ সাধিত এবং সারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

ওজন-পরিমাপে হের-ফের করার হীন মানসিকতা দূর করার জন্য হযরত শোয়ায়েব (আঃ) প্রথমে স্বীয় দেশবাসীকে পয়গম্বরসুলভ স্নেহ ও দরদের সাথে বললেন إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ "বর্তমানে আমি তোমাদের অবস্থা খুব ভাল ও সচ্ছ দেখছি। তঞ্চকতার আশ্রয় গ্রহণ করার মত কোন কারণ দেখি না। তাই আল্লাহ্ তাআলার এ অনুগ্রহে শোকর আদায় করার জন্য হলেও তোমাদের পক্ষে তাঁর কোন সৃষ্ট জীবকে ঠকানো উচিত নয়। তোমরা যদি আমার কথা না শোন, আমার নিষেধ অমান্য কর, তাহলে আমার ভয় হয় যে, আল্লাহ্‌র আযাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এখানে আখেরাতের আযাব বোঝানো হয়েছে, দুনিয়ার আযাবও হতে পারে, আবার দুনিয়ার আযাব বিভিন্ন প্রকারও হতে পারে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন আযাব হচ্ছে, তোমাদের স্বচ্ছলতা খতম হয়ে যাবে, তোমরা অভাবগ্রস্ত দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে। যেমন রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন—"যখন কোন জাতি মাপে কম দিতে শুরু করে তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধিজনিত শাস্তিতে পতিত করেন।"

ওজন-পরিমাপে কম দিতে নিষেধ করার মধ্যেই পরোক্ষভাবে যদিও সঠিক ওজন করার আদেশ হয়ে গেছে, তথাপি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হযরত শোয়ায়েব (আঃ) উদাত্ত আহ্বান জানালেন وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ "হে আমার জাতি ! ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে ঠিক ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কম দিও না আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।" অতঃপর তিনি মমতার সাথে আরো বললেন ঃ

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ

"মানুষের পাওনা ঠিকমত ওজন করে পুরোপুরি দিয়ে দেয়ার পর যে লভ্যাংশ উদ্বৃত্ত থাকে, তোমাদের জন্য তা-ই উত্তম। পরিমাণে স্বল্প হলেও আল্লাহ্ তাআলা তার মধ্যে বরকত দান করবেন, যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর। আর যদি অমান্য কর, তবে মনে রেখ-তোমাদের উপর কোন আযাব অবতীর্ণ হলে, তা থেকে তোমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমার নয়।"

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) সম্বন্ধে রসূলে করীম (সাঃ) মন্তব্য করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন 'খতীবুল-আম্বিয়া' বা নবীগণের মধ্যে প্রধান বক্তা। তিনি তাঁর সুললিত বয়ান ও অপূর্ব বাগ্মীতার মাধ্যমে স্বীয় জাতিকে বোঝানো এবং সৎপথে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু এত কিছু শোনার পরেও তাঁর কওমের লোকেরা পূর্ববর্তী বর্বর পাপিষ্ঠদের ন্যায় একই জবাব দিল। তারা নবীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতঃ আল্লাহ্‌র নবীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলল ঃ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

আপনার নামায কি আপনাকে শিখায় যে, আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দেই, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যার পূজা করে আসছে। আর আমাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করার

অধিকারী না থাকি? কোন্‌টা হালাল কোন্‌টা হারাম তা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে করে সব কাজ করতে হবে?

হযরত শোয়েব (আঃ) সম্পর্কে সারাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি অধিকাংশ সময় নামায ও নফল এবাদতে মগ্ন থাকেন। তাই তারা তাঁর মূল্যবান নীতি বাক্যসমূহকে বিদ্রূপ করে বলতো– আপনার নামায কি আপনাকে এসব আবোল–তাবোল কথাবার্তা শিক্ষা দিচ্ছে?

ওদের এসব মন্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, এরা ধর্মকে শুধু কতিপয় আচার–আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করতো। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মকে কোন দখল দিত না। তারা মনে করত, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধন–সম্পদ যেমন খুশী ভোগ দখল করতে পারে, এ ক্ষেত্রে কোন বিধি–নিষেধ আরোপ করা ধর্মের কাজ নয়। যেমন, বর্তমান যুগেও কোন কোন অবুঝ লোকের মধ্যে এহেন চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়।

অকৃত্রিম দরদ, নিঃস্বার্থ কল্যাণকামিতা ও সদুপদেশের জবাবে কওমের লোকেরা কতবড় রূঢ় মন্তব্য করল! কিন্তু হযরত শোয়ায়েব (আঃ)–এর চরিত্রে ছিল নবীসুলভ সহনশীলতা। তাই উপহাস–পরিহাসের পরেও তিনি দরদের সাথে তাদেরকে সম্বোধন করে বোঝাতে লাগলেন ঃ

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا

হে আমার জাতি! তোমরা বলতো, যদি আমার প্রভুর পক্ষ হতে আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য আমার কাছে থাকে এবং আল্লাহ্‌ তাআলা যদি আমাকে সর্বাধিক উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, অর্থাৎ, দেহের জন্য প্রয়োজনীয় বাহ্যিক রিযিকও দান করেছেন অধিকন্তু বুদ্ধি–বিবেচনা তথা নবুওয়তের দুর্লভ মর্যাদাও দান করেছেন, এতদসত্ত্বেও কি আমি তোমাদের মত অন্যায় ও গোমরাহীর পথ অবলম্বন করব এবং সত্যের বাণী তোমাদেরকে পৌঁছাব না?

অতঃপর তিনি আরো বললেন -

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ

তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি যে কাজ হতে তোমাদেরকে বাধা দেই, নিজেও তার কাছে কখনো যাই না। আমি যদি তোমাদেরকে নিষেধ করে নিজে সে কাজ করতাম তাহলে তোমাদের কথা বলার অবকাশ ছিল।

এতদ্বারা বোঝা গেল যে, ওয়াজ নসিহত ও তবলীগকারীর কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা অপরিহার্য। অন্যথায় তার কথায় শ্রোতাদের কোন ফায়দা হয় না।

অতঃপর বলেন– اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

"আমার আপ্রাণ চেষ্টা এবং বার বার বোঝাবার একমাত্র উদ্দেশ্য তোমাদেরকে যথাসাধ্য সংশোধন করা। অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আর চেষ্টা–সাধনাও নিজ বাহু বলে নয় বরং —

وَمَا تَوْفِيْقِىْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

"আমি যা কিছু করছি তা আল্লাহ্‌র মদদেই করছি। অন্যথায় আমার চেষ্টা করারও সাধ্য ছিল না। তাঁর উপরই আমি ভরসা রাখি এবং সর্বকাজে সর্বাবস্থায় তাঁরই প্রতি রুজু হই।"

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ
قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ۭ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ
بِبَعِيْدٍ ۝٨٩ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۭ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ
وَّدُوْدٌ ۝٩٠ قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا
لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۡ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا
بِعَزِيْزٍ ۝٩١ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَ
اتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَاۗءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۭ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۝٩٢
وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰي مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۭ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ
مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۭ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّىْ
مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۝٩٣ وَلَمَّا جَاۗءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ
فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝٩٤ ۙ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۭ اَلَا
بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ۝٩٥ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى
بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝٩٦ ۙ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ
فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۝٩٧

(৮৯) আর হে আমার জাতি! আমার সাথে জিদ করে তোমরা নূহ বা হূদ অথবা সালেহ (আঃ)-এর কওমের মত নিজেদের উপর আযাব ডেকে আনবে না। আর লূতের জাতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়। (৯০) আর তোমাদের পালনকর্তার কাছে মার্জনা চাও এবং তাঁরই পানে ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগার খুবই মেহেরবান অতিস্নেহময়। (৯১) তারা বলল— হে শোয়ায়েব (আঃ), আপনি যা বলেছেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝি নাই, আমরা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তিরূপে মনে করি। আপনার ভাই-বন্ধুরা না থাকলে আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি নন! (৯২) শোয়ায়েব (আঃ) বলেন— হে আমার জাতি, আমার ভাই-বন্ধুরা কি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র চেয়ে প্রভাবশালী? আর তোমরা তাকে বিস্মৃত হয়ে পেছনে ফেলে রেখেছ, নিশ্চয় তোমাদের কার্যকলাপ আমার পালনকর্তার আয়ত্তে রয়েছে। (৯৩) আর হে আমার জাতি, তোমরা নিজ স্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি, অচিরেই জানতে পারবে কার উপর অপমানকর আযাব আসে আর কে মিথ্যাবাদী? আর তোমরাও অপেক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। (৯৪) আর আমার হুকুম যখন এল, আমি শোয়ায়েব (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে রক্ষা করি আর পাপিষ্ঠদের উপর বিকট গর্জন পতিত হলো। ফলে ভোর না হতেই তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৯৫) যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করে নাই। জেনে রাখ, সামূদের প্রতি অভিসম্পাতের মত মাদইয়ানবাসীর উপরেও অভিসম্পাত। (৯৬) আর আমি মূসা (আঃ)-কে প্রেরণ করি আমার নিদর্শনাদি ও সুস্পষ্ট সনদসহ; (৯৭) ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে; তবুও তারা ফেরাউনের হুকুমে চলতে থাকে, অথচ ফেরাউনের কোন কথা ন্যায়-সঙ্গত ছিলনা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নসীহত ও উপদেশ দানের পরে তিনি পুনরায় তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে সতর্ক করে বললেন–

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ
نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ۭ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ

হে আমার কওম, সাবধান! আমার সাথে বিদ্বেষ ও জিদ করে তোমরা নিজেদের উপর কওমে নূহ অথবা কওমে হুদ কিংবা সালেহ (আঃ)-এর কওমের মত বিপদ ডেকে আনবে না। আর লূত (আঃ)-এর জাতি ও তাদের শোচনীয় পরিণত তো তোমাদের থেকে খুব দূরেও নয়। অর্থাৎ, কওমে লূতের উল্টিয়ে দেয়া জনপদগুলি মাদইয়ান শহরের অদূরেই অবস্থিত। তাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনা তোমাদের সময় থেকে খুব আগের কোন ব্যাপার নয়। অতএব, উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং হঠকারিতা পরিত্যাগ কর।

কওমের লোকেরা একথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগল— "আপনার গোষ্ঠী-জ্ঞাতির কারণে আমরা এতদিন আপনাকে কিছু বলিনি। নতুবা অনেক আগেই প্রস্তর আঘাতে আপনাকে হত্যা করে ফেলতাম।"

এরপরে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে নসীহত করে বললেন— "তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজনকে ভয় কর, সম্মান কর, অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় কর না।"

শেষ পর্যন্ত কওমের লোকেরা যখন হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কোন কথা মানল না, তখন তিনি বললেন— 'ঠিক আছে, তোমরা এখন আযাবের অপক্ষো করতে থাক।' অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুসারে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী ঈমানদারগণকে উক্ত জনপদ হতে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন এবং হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর এক ভয়ঙ্কর হাঁকে অবশিষ্ট সবাই এক নিমেষে ধ্বংস হল।

আহ্‌কাম ও মাসায়েল

মাপে কম দেয়া ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে মাদইয়ানবাসী ধ্বংস হওয়ার অন্যতম কারণ নির্দেশ করা হয়েছে মাপে কম দেয়াকে, আরবীতে যাকে 'ততফীফ' বলা হয়। কোরআন করীমের— وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ 'আয়াতে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ওলামায়ে উম্মতের 'এজমা' বা সর্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহা সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম মালেক (রহঃ) তদীয় 'মোয়াত্তা' কিতাবে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, ওজনে-পরিমাপে কম দেয়ার কথা বলে, আসলে বোঝান হয়েছে- কারো কোন ন্যায্য পাওনা পুরোপুরি না দিয়ে কম দেয়া; তা ওজন ও পরিমাপ করার বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু হোক। কোন বেতনভোগী কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে গড়িমসি করে, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কম সময় কাজ করে, কোন শিক্ষক যদি যত্ন সহকারে শিক্ষাদান না করে অথবা কোন নামাযী ব্যক্তি যদি নামাযের সুন্নতগুলি পালনে অবহেলা করে তবে তারাও উক্ত তাতফীফের অপরাধীদের তালিকাভুক্ত হবে।—(নাউজুবিল্লাহি মিনহু)

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ
الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾ وَأُتْبِعُوا فِي هٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ بِئْسَ
الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾ ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا
قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا
أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ
شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿١٠١﴾ وَكَذٰلِكَ
أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ
شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ
ذٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا
نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا
بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي
النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا
يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾

(৯৮) কেয়ামতের দিন সে তার জাতির লোকদের আগে আগে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পৌছে দিবে, আর সেটা অতীব নিকৃষ্ট স্থান, যেখানে তারা পৌছেছে। (৯৯) আর এ জগতেও তাদের পেছনে লানত রয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও; অত্যন্ত জঘন্য প্রতিফল, যা তারা পেয়েছে। (১০০) এ হচ্ছে কয়েকটি জনপদের সামান্য ইতিবৃত্ত, যা আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। তন্মধ্যে কোন কোনটি এখনও বর্তমান আছে আর কোন কোনটির শিকড় কেটে দেয়া হয়েছে। (১০১) আমি কিন্তু তাদের প্রতি জুলুম করি নাই বরং তারা নিজেরাই নিজের উপর অবিচার করেছে। ফলে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা যেসব মাবুদকে ডাকতো আপনার পালনকর্তার হুকুম যখন এসে পড়ল, তখন কেউ কোন কাজে আসল না। তারা শুধু বিপর্যয়ই বৃদ্ধি করল। (১০২) আর তোমার পরওয়ারদেগার যখন কোন পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মারাত্মক, বড়ই কঠোর। (১০৩) নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন প্রতিটি মানুষের জন্য যে আখেরাতের আযাবকে ভয় করে। উহা এমন একদিন, যেদিন সব মানুষেই সমবেত হবে, সেদিনটি যে হাযিরের দিন। (১০৪) আর আমি যে উহা বিলম্বিত করি, তা শুধু একটি ওয়াদার কারণে যা নির্ধারিত রয়েছে। (১০৫) যেদিন তা আসবে সেদিন আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। অতঃপর কিছু লোক হবে হতভাগ্য, আর কিছু লোক সৌবাগ্যবান। (১০৬) অতএব যারা হতভাগ্য তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। (১০৭) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদেগার যা ইচ্ছা করতে পারেন। (১০৮) আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতের মাঝে, সেখানেই চিরদিন থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়।

মাসআলা ঃ তফসীরে কুরতুবীতে আছে যে, মাদইয়ানবাসীর আরেকটি দুষ্কর্ম ছিল যে, তারা প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার পার্শ্ব হতে স্বর্ণ-রৌপ্য কেটে রেখে সেগুলো বাজারে চালিয়ে দিত। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করেছিলেন।

হাদীস শরীফে আছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) মুসলিম রাষ্ট্রের মুদ্রা ভঙ্গ করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কোরআন পাকের ১৯ পারা, সূরাহ্‌ নমল ৪৮ নং আয়াত تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামুল মোফাসেরীন হযরত জায়েদ ইবনে আসলাম বলেন—মাদইয়ানবাসীরা দীনার ও দিরহাম কেটে তা থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য আত্মসাৎ করতো। যাকে কোরআন করীমের ভাষায় মারাত্মক দুষ্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিযের (রহঃ) খেলাফত কালে এক ব্যক্তিকে দিরহাম কর্তনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। খলিফা তাকে দোর্রা মারা ও মস্তক মুন্ডন করে শহরে প্রদক্ষিণ করাবার নির্দেশ দিলেন।—(তফসীরেকুরতুবী

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হুদে হযরত নূহ (আঃ) থেকে হযরত মূসা (আঃ) পর্যন্ত বিশিষ্ট নবীগণ ও তাঁদের জাতিসমূহের ঘটনাবলী এক বিশেষ বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে বিবৃত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বহু উপদেশ, হেকমত, আহকাম ও হেদায়েত বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উক্ত ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য রসূলে করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে সমগ্র উম্মতে-মুহাম্মদীকে আহ্বান জানান হয়েছে। এরশাদ হয়েছে—

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ

অর্থাৎ, এটা পূর্ববর্তী যুগে কতিপয় শহর ও জনপদের কাহিনী, আমি আপনার সামনে তুলে ধরছি, যার উপর আল্লাহ্‌র আযাব আপতিত হয়েছে। তন্মধ্যে কোন কোন শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। আর কোন কোন জনপদকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, যেমন ক্ষেতের ফসল কর্তন করে তাকে সমান করার পর পূর্ববর্তী ফসলের কোন চিহ্ন থাকে না।

অতঃপর বলেন যে, আমি তাদের উপর কোন জুলুম করি নাই, বরং তারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে। কেননা, তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা প্রভুকে পরিত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া, হাতে তৈরী মূর্তিকে বা অন্য কিছুকে মা'বুদ সাব্যস্ত করেছে। যার ফলে আল্লাহ্‌র আযাব যখন নেমে এল, তখন ঐসব কাল্পনিক মা'বুদেরা তাদের কোন সাহায্য করতে পারল না। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন কোন জনপদবাসীকে আযাবের সাথে পাকড়াও করেন, তখন অত্যন্ত শক্ত ও নির্মমভাবে পাকাড়ও করেন।' তখন আত্মরক্ষার জন্য কারো কোন গত্যন্তর থাকে না।

অতঃপর সবাইকে আখেরাতের চিন্তায় মশগুল করার জন্য এরশাদ করেন যে, এসব ঘটনাবলীর মধ্যে ঐসব লোকের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনাবলী রয়েছে, যারা পরকালের আযাবকে ভয় করে। যেদিন সমগ্র মানবজাতি একই ময়দানে সমবেত হবে, সেদিনটি এতই ভয়াবহ যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারবেন না।

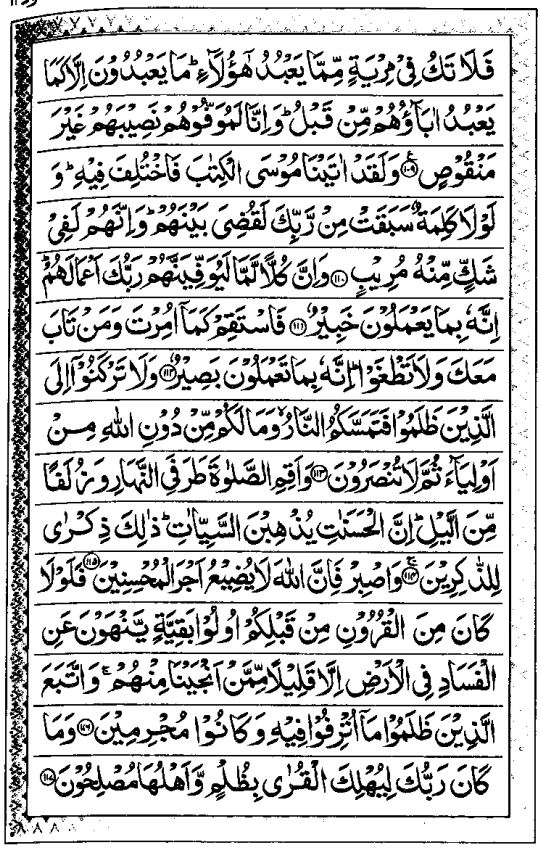

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا
يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ
مَنقُوصٍ ﴿١٠٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَ
لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي
شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١٠﴾ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ
إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ
مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ
أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا
مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ
لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾ فَلَوْلَا
كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ
الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾ وَمَا
كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾

(১০৯) অতএব, তারা যেসবের উপাসনা করে তুমি সে ব্যাপারে কোনরূপ ধোঁকায় পড়বে না। তাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারা যেমন পূজা উপাসনা করত, এরাও তেমন করছে। আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে আযাবের ভাগ কিছু মাত্র কম না করেই পুরোপুরি দান করবো। (১১০) আর আমি মূসা (আঃ)-কে অবশ্যই কিতাব দিয়েছিলাম অতঃপর তাতে বিরোধ সৃষ্টি হল; বলাবাহুল্য তোমার পালনকর্তার পক্ষ হতে, একটি কথা যদি আগেই বলা না হত, তাহলে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত। তারা এ ব্যাপারে এমনই সন্দেহপ্রবণ যে, কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছে না। (১১১) আর যত লোকই হোক না কেন, যখন সময় হবে, তোমার প্রভু তাদের সকলেরই আমলের প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন। নিশ্চয় তিনি তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের খবর রাখেন। (১১২) অতএব, তুমি এবং তোমার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলে যাও— যেমন তোমায় হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সীমা লঙ্ঘন করবে না, তোমরা যা কিছু করছ, নিশ্চয় তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। (১১৩) আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না। (১১৪) আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতেরও প্রান্তভাগে; পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক। (১১৫) আর ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। (১১৬) কাজেই, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলির মধ্যে এমন সৎকর্মশীল কেন রইল না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত; তবে মুষ্টিমেয় লোক ছিল যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছি। আর পাপিষ্ঠরা তো ভোগবিলাসে মত্ত ছিল—যার সামগ্রী তাদেরকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছিল। আসলে তারা ছিল মহা অপরাধী। (১১৭) আর তোমার পালনকর্তা এমন নন যে জনবসতিগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, সেখানকার লোকেরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে পুনরায় এরশাদ করেছেন—

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থাৎ, আপনি দ্বীনের পথে দৃঢ়ভাবে সোজা চলতে থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর যারা কুফরী হতে তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে, তারাও সোজা পথে চলুক এবং আল্লাহ্ তাআলার নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে না। কেননা, তিনি তোমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছেন।

ইস্তেকামতের তাৎপর্য, উপকারিতা ও মাসায়েল ঃ 'ইস্তেকামতে'র আসল অর্থ হচ্ছে, কোনদিক একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা। বস্তুতঃ এ কোন সহজ কাজ নয়। কোন লৌহদন্ড বা পাথরের থাম একজন সুদক্ষ প্রকৌশলী হয়ত এমনভাবে দাঁড় করাতে পারে, কিন্তু কোন প্রাণীর পক্ষে সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকা কত দুষ্কর তা কোন সাধারণ বোধসম্পন্ন ব্যক্তির অজানা নয়।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ও সকল মুসলমানকে তাদের সর্বকার্যে সর্বাবস্থায় ইস্তেকামত অবলম্বন করার জন্য অত্র আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

'ইস্তেকামত' শব্দটি ছোট হলেও এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা, সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে— আকায়েদ, এবাদত, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ উপার্জন ও ব্যয় তথা নীতি-নৈতিকতার যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে তাঁরই নির্দেশিত সোজা পথে চলা। তন্মধ্যে কোন ক্ষেত্রে, কোন কার্যে এবং পরিস্থিতিতে গড়িমসি করা, বাড়াবাড়ি করা অথবা ডানে বামে ঝুঁকে পড়া ইস্তেকামতের পরিপন্থী।

দুনিয়ার যত গোমরাহী ও পাপাচার দেখা যায়, তা সবই ইস্তেকামত হতে সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। আকায়েদ অর্থাৎ, ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইস্তেকামত না থাকলে, মানুষ বেদ'আত হতে শুরু করে কুফরী ও শেরেকী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তাআলার তওহীদ, তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যে সুষ্ঠু ও সঠিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্ধন পরিবর্জনকারী পথভ্রষ্টরূপে আখ্যায়িত হবে, তা তার নিয়ত যতই ভাল হোক না কেন। অনুরূপভাবে নবী ও রসূল (আঃ)-গণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে, সে ব্যাপারে ত্রুটি করা স্পষ্ট ধৃষ্টতা ও পথভ্রষ্টতা।

তেমনি কোন রসূলকে খোদায়ী গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিক বানিয়ে দেয়াও চরম পথভ্রষ্টতা। ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা এহেন বাড়াবাড়ির কারণেই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে। এবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করার জন্য কোরআনে আযীম ও রসূলে করীম (সাঃ) যে পথনির্দেশ করেছেন, তার মধ্যে কোনরূপ কমতি বা গাফলতি মানুষকে যেমন ইস্তেকামতের আদর্শ হতে বিচ্যুত করে, অনুরূপভাবে তার মধ্যে নিজের পক্ষ হতে কোন বাড়াবাড়ি বা পরিবর্ধনও মানুষকে বেদ'আতে লিপ্ত করে। সে কল্পনাবিলাসে বিভোর থাকে যে, আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিল করছি, অথচ সে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্ তাআলার বিরাগভাজন হতে থাকে। এজন্যই হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) স্বীয় উম্মতকে বেদ'আত ও নিত্য নতুন

সৃষ্ট প্রথা হতে অত্যন্ত জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন এবং বেদ'আতকে চরম গোমরাহী বলে অভিহিত করেছেন। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে, যখন কোন কার্য সে আল্লাহ্ ও রসূল (সাঃ)-এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবাদত হিসাবে করতে চায়, তখন কাজ করার আগে পূর্ণ তাহকীক করে জানতে হবে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উক্ত কার্য ঐভাবে করেছেন কি না? যদি না করে থাকেন, তবে উক্ত কাজে নিজের শক্তি ও সময়ের অপচয় করবে না।

অনুরূপভাবে আদান-প্রদান, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন করীমে নির্দেশিত মূলনীতিগুলিকে রসূলে করীম (সাঃ) বাস্তবে রূপায়িত করে একটা সুষ্ঠু সঠিক মধ্যপন্থার পত্তন করেছেন। যার মধ্যে বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ক্রোধ, ধৈর্য, মিতব্যয় ও দানশীলতা, জীবিকা উপার্জন, বৈরাগ্য সাধনা, আল্লাহ্র উপর নির্ভরতা, সম্ভাব্য চেষ্টা-তদ্বির করা, আবশ্যকীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহের প্রতি তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এক নজীরবিহীন মধ্যপন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন। তা পুরোপুরি অবলম্বন করেই মানুষ সত্যিকার মানুষ হতে পারে। তা থেকে বিচ্যুত হলেই সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সারকথা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে দ্বীনের অনুশাসন মেনে চলাই ইস্তেকামতের তফসীর।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফী (রাঃ) রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) সমীপে আরজ করলেন, "ইয়া রসূলল্লাহ্ (সাঃ)! ইসলাম সম্পর্কে আপনি আমাকে এমন একটি ব্যাপক শিক্ষা দান করুন যেন আপনার পরে আমার কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়।" তিনি বললেন— قل أمنت بالله ثم استقم অর্থাৎ, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন, অতঃপর ইস্তেকামত অবলম্বন কর।—(মুসলিম শরীফ ও তফসীরে কুরতুবী)

ওসমান ইবনে হাযের আযদী বলেন— একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম যে, "আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন। তদুত্তরে তিনি বললেন عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع অর্থাৎ — তাকওয়া বা খোদাভীতি ও ইস্তেকামত অবলম্বন কর, যার পন্থা হচ্ছে ধর্মীয় ব্যাপারে শরিয়তের অনুশাসন হুবহু মেনে চল, নিজের পক্ষ হতে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে যেয়ো না।—(দারেমী ও কুরতুবী)

এ দুনিয়ায় ইস্তেকামতই সবচেয়ে দুষ্কর কার্য। এজন্যই বুযুর্গানেদ্বীন বলেন যে, কারামতের চেয়ে ইস্তেকামতের মর্যাদা উর্ধ্বে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সর্বকার্যে ইস্তেকামত অবলম্বন করে, যদি জীবনভর তাঁর দ্বারা কোন অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত না হয়, তথাপি ওলীগণের মধ্যে তাঁর মর্যাদা সবার উর্ধ্বে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন— "পূর্ণ কোরআন পাকের মধ্যে অত্র আয়াতের চেয়ে কঠিন ও কষ্টকর কোন হুকুম রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর উপর নাযিল হয় নাই।" তিনি আরো বলেন—একবার সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাড়ি মোবারকের কয়েক গাছি পেকে গেছে দেখতে পেলেন, তখন আফসোস করে বললেন, আপনার দিকে দ্রুত গতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসছে। তদুত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন—"সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে।" সূরা হুদে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির উপর কঠোর আযাবের ঘটনাবলীও এর কারণ হতে পারে। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন— 'ইস্তেকামতের' নির্দেশই ছিল বার্ধক্যের কারণ।

তফসীরে কুরতুবীতে হযরত আবু আলী সিরী হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি স্বপ্নে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জেয়ারত লাভ করে জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ), আপনি কি একথা বলেছেন যে, "সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে?" তিনি বললেন "হাঁ"। পুনরায় প্রশ্ন করলেন—উক্ত সূরায় বর্ণিত নবী (আঃ)-গণের কাহিনী ও তাঁদের কওমসমূহের উপর আযাবের ঘটনাবলী কি আপনাকে বৃদ্ধ করেছে? তিনি জবাব দিলেন—"না"। বরং فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ "ইস্তেকামত অবলম্বন কর যেমন তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" এ আয়াতই আমাকে বৃদ্ধ করেছে।

একথা স্পষ্ট যে, রসূলে করীম (সাঃ) পরিপূর্ণ মানুষের বাস্তব নমুনারূপে এ জগতে সুভাগমন করেছিলেন। ইস্তেকামতের উপর সুদৃঢ় থাকা ছিল তাঁর জন্মগত স্বভাব। তথাপি অত্র নির্দেশকে এতদূর গুরুভার মনে করার কারণ এই যে, অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে শুধু সোজা পথে দৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং كَمَا أُمِرْتَ "যেভাবে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে" বলে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা হয়েছে। নবী ও রসূল (আঃ)-গণের অন্তরে অপরিসীম খোদাভীতি প্রবল প্রভাবের কথা কারো অজানা নয়। তাই পূর্ণ ইস্তেকামতের উপর কায়েম থাকা সত্ত্বেও রসূলে পাক (সাঃ) সবর্দা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা যেরূপ ইস্তেকামতের নির্দেশ দিয়েছেন, তা পুরোপুরি আদায় করা হচ্ছে কি না?

আরেকটি কারণ হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের ইস্তেকামতের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। কেননা, আল্লাহ্র ফজলে তা পূর্ণ মাত্রায় হাসিল ছিল। কিন্তু উক্ত আয়াতে সমগ্র উম্মতকে সোজা পথে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ উম্মতের জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) অতীব চিন্তিত ও শঙ্কিত ছিলেন।

ইস্তেকামতের আদেশ দানের পর বলেন وَلَا تَطْغَوْا 'সীমালঙ্ঘন করো না। এটা طغيان শব্দ হতে গৃহীত। যার অর্থ সীমা অতিক্রম করা। এখানে সোজা পথে দৃঢ় থাকার আদেশ দান করেই শুধু ক্ষান্ত করা হয় নাই। বরং তার নেতিবাচক দিকটিও স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, আকায়েদ, এবাদত, লেন-দেন ও নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা ও তদীয় রসূল (সাঃ)-এর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করো না। কেননা, এটাই পার্থিব ও ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় ও ফাসাদের মূল কারণ।

১১৩ নং আয়াতে মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংস হতে থেকে রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে — وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ অর্থাৎ, "ঐসব পাপিষ্ঠদের দিকে একটুও ঝুঁকবে না, তাহলে কিন্তু তাদের সাথে সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে।" "লা-তারকানু" শব্দের মূল হচ্ছে ركون যার অর্থ "কোন দিকে সামান্যতম ঝোঁকা বা আকৃষ্ট হওয়া এবং তার প্রতি আস্থা বা সম্মতি জ্ঞাপন করা।" সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, পাপ-পঙ্কিলতায় লিপ্ত হওয়াকে তো সবাই ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর বলে বিশ্বাস করেই; অধিকন্তু পাপিষ্ঠদের প্রতি সামান্যতম ঝুঁকে পড়া, আকৃষ্ট হওয়া, আস্থা বা মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করাও সমান ক্ষতিকর।

এই ঝোঁকা ও আকর্ষণের অর্থ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের কয়েকটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই। বরং প্রত্যেকটি উক্তিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও সঠিক।

"পাপিষ্ঠদের প্রতি মোটেই ঝুঁকবে না" এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন— "পাপিষ্ঠদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না, তাদের কথামত চলবে না।" হযরত ইবনে জোরাইজ বলেন—"পাপিষ্ঠদের প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হবে না। হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন— "তাদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তা পছন্দ করো না।''—(কুরতুবী) 'সুদ্দী' (রঃ) বলেন—''তাদের অন্যায় কার্যে সম্মতি প্রকাশ বা নীরবতা অবলম্বন করবে না।" ইকরিমা (রাঃ) বলেন—তাদের সংসর্গে থাকবে না। কাযী 'বায়জাবী' (রঃ) বলেন—"বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে, লেবাস-পোশাকে, চাল-চলনে তাদের অনুকরণও অত্র নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।"

কাযী বায়জাবী (রাঃ) আরো বলেন—পাপাচার অনাচারকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করার জন্য এখানে এমন কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যার চেয়ে অধিকতর জোরালো ভাষা কল্পনা করা যায় না। কেননা, পাপিষ্ঠদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ককেই শুধু নিষেধ করা হয়নি বরং তাদের প্রতি সামান্যতম আকৃষ্ট হওয়া, তাদের কাছে উপবেশন করা, তাদের কার্যকলাপের প্রতি মৌনতা অবলম্বনও নিষেধ করা হয়েছে।

ইমাম আওযায়ী (রাঃ) বলেন—সমগ্র জগতে ঐ আলেমই আল্লাহ্ তাআলার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়—যে নিজের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়।—(তফসীরে মাযহারী)

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যায়—কাফের মুশরিক, বেদআতী ও পাপিষ্ঠদের সংসর্গ হতে দূরে থাকা একান্ত কর্তব্য। বস্তুতঃ মানুষের ভাল-মন্দ হওয়ার মধ্যে সংসর্গ ও পরিবেশের প্রভাবই সর্বাধিক। তবে একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজনবশতঃ অনন্যোপায় হয়ে তাদের কাছে যাওয়া জায়েয।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের দু'টি শব্দ সম্পর্কে বলেন—আল্লাহ্ তাআলা সম্পূর্ণ দ্বীনকে দুটি لا হরফের মাঝে জমা করে দিয়েছেন। এক وَلَا تَطْغَوْا সীমালঙ্ঘন করবে না, দ্বিতীয়- وَلَا تَرْكَنُوٓا পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। প্রথম আয়াতে শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে খারাপ লোকদের সংস্পর্শে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এটাই সমস্ত দ্বীনদারীর সার সংক্ষেপ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রসূলে পাক (সাঃ)-এর মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত ঃ সূরা হূদে পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাঁদের জাতিসমূহের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর নবীয়ে-করীম (সাঃ) ও উম্মতে মুহাম্মদীকে কতিপয় হেদায়েত দেয়া হয়েছে। পূর্বোল্লেখিত فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ আয়াত হতে যার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে।

কোরআন পাকের অপূর্ব বাচনভঙ্গি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। এখানে যেসব আদেশ প্রদান করা হয়েছে, তাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে এবং উম্মতকে পরোক্ষভাবে উক্ত হুকুমের আওতায় আনা হয়েছে। যেমন— فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ "আপনি সোজা পথে দৃঢ় থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং যারা তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে তারাও সোজাপথে চলতে থাকবে।" (১১২ নং আয়াত) ১১৪ নং আয়াতে وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ "আপনি নামায কায়েম রাখুন।" ১১৫ তম আয়াতে وَاصْبِرْ 'আপনি ধৈর্যধারণ করুন' ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যেসব কাজে নিষেধ করা হয়েছে এবং তা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে সরাসরি উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন ১১২তম আয়াতে وَلَا تَطْغَوْا "আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে না" ১১৩ নং আয়াতে وَلَا تَرْكَنُوٓا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا "এবং তোমরা পাপীদের প্রতি ঝুঁকবে না" বলা হয়েছে।

অনুসন্ধান করলে সমগ্র কোরআন মজীদে সাধারণতঃ একই বাচনভঙ্গি পরিলক্ষিত হবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদেশ করা হয়েছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে এবং নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে উম্মতের প্রতি সম্বোধন করে। যার মাধ্যমে রসূলে করীম (সাঃ)-এর মাহাত্ম্য ও উচ্চমর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে যে, নিন্দনীয় যত কাজ আছে, রসূলে পাক (সাঃ) নিজেই তা বর্জন করে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলাই তাঁকে এমন স্বভাব-প্রকৃতি দান করেছেন যে, কোন নিন্দনীয় প্রবৃত্তি বা পাপকার্যের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ হয় না। এমনকি ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেসব জিনিস জায়েয ও হালাল ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়া আল্লাহ্ তাআলার জানা ছিল; রসূলে পাক (সাঃ) জীবনে কখনো সেগুলোর কাছেও যান নি। যেমন মদ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি।

১১৪তম আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে তাঁকে ও তাঁর সমস্ত উম্মতকে নামায কায়েম রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ওলামায়ে-তফসীর, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ একমত যে, আলোচ্য আয়াতে সালাত অর্থ ফরয নামায, (বাহরে মুহীত ও তফসীরে কুরতুবী) এবং একামতে সালাত অর্থ পূর্ণ পাবন্দীর সাথে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করা। কোন কোন আলেমের মতে নামায কায়েম করার অর্থ সমুদয় সুন্নত ও মুস্তাহাবসহ নামায আদায় করা। কারো মতে এর অর্থ মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায পড়া وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ এর তফসীর প্রসঙ্গে উপরোক্ত তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। মূলতঃ এটা কোন মতানৈক্য নয়। বস্তুতঃ আলোচ্য সবগুলোই একামতে সালাতের সঠিক মর্মার্থ।

নামায কায়েম করার নির্দেশ দানের পর সংক্ষিপ্তভাবে নামাযের ওয়াক্ত বর্ণনা করেছেন যে, "দিনের দু'প্রান্তে অর্থাৎ, শুরুতে ও শেষভাগে এবং রাতেরও কিছু অংশে নামায কায়েম করবে।" দিনের দু'প্রান্তের নামাযের মধ্যে প্রথমভাগের নামায সম্পর্কে সবাই একমত যে, সেটি ফজরের নামায। কিন্তু শেষ প্রান্তের নামায সম্পর্কে কেউ বলেন-তা মাগরিবের নামায। কেননা, দিন সম্পূর্ণ শেষ হওয়া মাত্র মাগরিবের নামায পড়া হয়। কেউ কেউ আসরের নামাযকেই দিনের শেষ নামায সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এটিই দিনের সর্বশেষ নামায। মাগরিবের ওয়াক্ত দিনের অংশ নয়, বরং দিন সমাপ্ত হওয়ার পর রাতের প্রথম প্রান্তে মাগরিবের নামায পড়া হয়। وَزُلَفًا শব্দ বহুবচন, তার একবচন زُلْفَةٌ যার অর্থ হচ্ছে অংশ বা টুকরা। وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ অর্থাৎ, রাতের কিছু অংশের নামায সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, কাতাদা, যাহ্হাক প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরকারের অভিমত হচ্ছে যে, সেটি মাগরিব ও এশার নামায। হাদীসেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়, যাতে এরশাদ হয়েছে

যে, وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ মাগরিব ও এশার নামায। তফসীরে ইবনে কাসীর অনুসারে طَرَفَيِ النَّهَارِ অর্থ, ফজর ও আছরের নামায এবং وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ অর্থ মাগরিব ও এশার নামায। অতএব অত্র আয়াতে চার ওয়াক্ত নামাযের বর্ণনা পাওয়া গেল। অবশিষ্ট রইল জোহরের নামায। তার ওয়াক্ত সম্পর্কে কোরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ "নামায কায়েম কর, যখন সূর্য ঢলে পড়ে।"

আলোচ্য আয়াতে নামায কায়েম করার নির্দেশ দানের সাথে সাথে তার উপকারিতাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে— إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ অর্থাৎ, পুণ্যকার্য অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়।' শ্রদ্ধেয় তফসীরকারগণের মতে এখানে পুণ্যকার্য বলতে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, সদকাহ, সদ্ব্যবহার, উত্তম লেন-দেন প্রভৃতি যাবতীয় পুণ্যকার্য বোঝান হয়েছে। তবে তন্মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাগ্রগণ্য। অনুরূপভাবে পাপকার্যের মধ্যে সগীরা ও কবীরা যাবতীয় গোনাহ শামিল রয়েছে। কিন্তু কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াত এবং রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, এখানে পাপকার্য দ্বারা সগীরা গোনাহ বোঝান হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হচ্ছে, যাবতীয় নেক কাজ, বিশেষ করে নামায সগীরা গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। কোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছে ঃ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ অর্থাৎ, তোমরা যদি বড় (কবীরা) গোনাহসমূহ হতে বিরত থাক যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট (সগীরা) গোনাহগুলি মিটিয়ে দেব।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, পাঞ্জেগানা নামায দ্বারা এক জুম'আ পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত এবং এক রমযান দ্বারা পরবর্তী রমযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী যাবতীয় (সগীরা) গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়া হয়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকে। অর্থাৎ, কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না, কিন্তু সগীরা গোনাহ নামায, রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি পুণ্যকর্ম করার ফলে আপনা-অপনিও মাফ হয়ে যায়। তবে "বাহরে মুহীত" নামক তফসীরে উসূল শাস্ত্রের মোহাক্কেক আলেমগণের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুণ্যকার্যের ফলে সগীরা গোনাহ মাফ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে, ভবিষ্যতে গোনাহ না করার সংকল্প থাকতে হবে এবং একই গোনাহে বার বার লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। অন্যথায় সগীরা গোনাহও মাফ হবে না। হাদীস শরীফের যেসব রেওয়ায়েতে গোনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, সেখানে সর্বত্র একই পাপকার্যে বার বার লিপ্ত না হওয়া, স্বীয় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা হতে দূরে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার শর্ত রয়েছে।

হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতসমূহে নিম্নবর্ণিত কাজগুলোকে কবীরা গোনাহ বলা হয়েছে ঃ (১) আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সত্তা অথবা গুণাবলীর মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। (২) শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ফরয নামায ছেড়ে দেয়া। (৩) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। (৪) ব্যভিচার করা। (৫) চুরি করা। (৬) মদ্য পান করা। (৭) মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। (৮) মিথ্যা কসম করা। (৯) মিথ্যা সাক্ষী দান করা। (১০) যাদু করা। (১১) সুদ খাওয়া। (১২) অবৈধভাবে এতীমের মাল আত্মসাৎ করা। (১৩) জেহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা। (১৪) সতী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। (১৫) অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া। (১৬) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। (১৭) আমানতের মাল খেয়ানত করা। (১৮) অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে গালি দেয়া। (১৯) কোন নির পরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ইত্যাদি। কবীরা ও সগীরা গোনাহসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে উলামায়ে কেরাম অনেক কিতাব প্রণয়ন করেছেন।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে, নেক কাজ করার ফলেও অনেক গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, "তোমাদের থেকে কোন মন্দ কাজ হলে পরে সাথে সাথে নেক কাজ কর, তাহলে উহার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।" তিনি আরো বলেছেন যে, মানুষের সাথে হাসি-খুশী ব্যবহার কর।—(মুসনাদে আহমদ ও তফসীরে ইবনে-কাসীর)

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সমীপে আরয করলাম যে, "ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ)! আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন।" তদুত্তরে তিনি বললেন—যদি তোমার থেকে কোন গোনাহর কাজ হয়ে যায়, তবে পরক্ষণেই কোন নেক কাজ কর, তাহলে গোনাহ মিটে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে এসব হাদীসে গোনাহ হতে তওবা করার সুন্নত তরীকা ও প্রশংসনীয় পন্থা বাতলে দেয়া হয়েছে। যেমন— মুসনাদে আহমদে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "যদি কোন মুসলমান কোন পাপকার্য করে বসে, তবে অযু করে তার দু'রাকাত নামায পড়া উচিত। তাহলে উক্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।" অত্র নামাযকে তওবার নামায বলে।—(ইবনে-কাসীর)

ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ এখানে ذٰلِكَ অর্থাৎ, "এটি শব্দ দ্বারা কোরআন মজীদের প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে অথবা ইতিপূর্বে বর্ণিত বিধি-নিষেধের প্রতিও ইশারা হতে পারে। সে মতে আয়াতের মর্ম হচ্ছে— এই কোরআন পাক অথবা এতে বর্ণিত হুকুম-আহকামসমূহ ঐসব লোকের জন্য স্মরণীয় হেদায়েত ও নসীহত, যারা উপদেশ শুনতে ও মানতে প্রস্তুত। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জেদী হঠকারী লোক যার নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কোন কথা চিন্তা-বিবেচনা করতে সম্মত নয়, তারা সুপথ হতে বঞ্চিত থাকে।

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ, "আপনি সবর অবলম্বন করুন, ধৈর্যধারণ করুন, অবিচল থাকুন। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করেন না।"

'সবর' শব্দের আভিধানিক অর্থ বাঁধা, বন্ধন করা। স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখাকেও সবর বলে। সৎকার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ এবং পাপকার্য হতে দমন রাখাও সবরের অন্তর্ভুক্ত। এখানে রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে 'সবর' অবলম্বন ও ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দানের এক উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে আপনাকে ইস্তেকামত ও নামায কায়েম করা ইত্যাদি যেসব হুকুম দেয়া হয়েছে, আপনি তার উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকুন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধাচরণ ও জুলুম-নির্যাতনে ধৈর্যাবলম্বন করুন। অতঃপর এরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয়, আল্লাহ্ তাআলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" এখানে স্পষ্টতঃ 'মুহসিনীন' বা সৎকর্মশীল শব্দ ঐসব লোকের উপর প্রযোজ্য হবে যারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধি-নিষেধের পূর্ণ অনুসারী, অর্থাৎ, ধর্মীয় ব্যাপারে ইস্তেকামতের উপর কায়েম এবং শরীয়তের সীমারেখা পরিপূর্ণ

বজায় রেখে চলেন। পাপিষ্ঠ জালেমদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব বা অহেতুক সম্পর্ক রাখেন না, নামাযকে সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে আদায় করেন এবং শরীয়তের যাবতীয় অনুশাসন দৃঢ়তার সাথে মেনে চলেন।

মোটকথা, মুহসিনীনদের দলভুক্ত হতে হলে এমনভাবে সৎকার্য করতে হবে যা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) 'ইহসান' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য ও এবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি আল্লাহ্কে দেখছ অথবা অন্ততঃ এতটুকু ধারণা করবে যে, আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সত্তা ও মহান গুণাবলী সম্পর্কে যখন কোন ব্যক্তির এ পর্যায়ের প্রত্যয় হাসিল হবে, তখনকার যাবতীয় কার্যকলাপই সুষ্ঠু ও সুন্দর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্যে তিনটি বাক্য বিশেষ প্রচলিত ছিল, যা তাঁরা প্রায়শঃই একে অপরকে লিখে পাঠাতেন। বাক্য তিনটি স্মরণ রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের কাজে মগ্ন হয়, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তার পার্থিব কাজগুলি অনায়াসলব্ধ এবং সুসম্পন্ন করে দেন। দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে—যে ব্যক্তি তার অন্তরকে ঠিক রাখবে অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুকেই অন্তর হতে বের করে দিয়ে অন্তরকে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তার বাহ্যিক অবস্থা ভাল করে দেবেন। তৃতীয় বাক্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক ঠিক রাখবে, তার সাথে অন্যান্য সকলের সম্পর্ক আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং ঠিক করে দেবেন। (রূহুল বয়ান, ২য় জিলদ ১৩১ পৃঃ)

১১৬ ও ১১৭তম আয়াতে পূর্ববর্তী জাতিগুলির উপর আযাব নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করে তা থেকে আত্মরক্ষার পথ নির্দেশ করা হয়েছে। এরশাদ করেছেন ঃ 'আফসোস, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে দায়িত্বশীল বিবেকবান কিছু লোক কেন ছিল না, যারা জাতিকে ফাসাদ সৃষ্টি করা হতে বিরত রাখত ? তাহলে তো তারা সমূলে ধ্বংস হত না। তবে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছিল, যারা নবী (আঃ)-গণের যথার্থভাবে অনুসরণ করেছে এবং তারাই আযাব হতে নিরাপদ ছিল। অবশিষ্ট লোকেরা পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে অপকর্মে মেতে উঠেছিল।

অত্র আয়াতে সমঝদার বিবেকসম্পন্ন লোকদেরকে أُولُوا بَقِيَّةٍ বলা হয়েছে। بَقِيَّةٍ অবশিষ্ট বস্তুকে বলে। মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তুকে নিজের জন্য সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করতে অভ্যস্ত। প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্য সব জিনিস হাতছাড়া করেও সেটি ধরে রাখার চেষ্টা করে। এ জন্যই বিবেক-বিবেচনা ও দূরদর্শিতাকে بَقِيَّةٍ বলা হয়। কেননা, এটি সর্বাধিক প্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ।

১১৭তম আয়াতে এরশাদ করেছেন যে, "আপনার পালনকর্তা জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে নিপাত করেন নাই এমতাবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল ও আত্ম-সংশোধনরত ছিল।" এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে অন্যায় অবিচারের কোন সম্ভাবনা নাই। যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়, তারা প্রকৃতপক্ষেই নিপাতযোগ্য, অপরাধী।

কোন কোন তফসীরকারের মতে অত্র আয়াতে ظلم জুলুম অর্থ শেরেকী এবং مُصْلِحُونَ অর্থে ঐসব লোক যারা কাফের-মুশরেক হওয়া সত্ত্বেও তাদের লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, নীতি-নৈতিকতা ভাল। যারা মিথ্যা কথা বলে না, ধোকাবাজী করে না, কারো কোন ক্ষতি করে না। সেমতে অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে, শুধু কাফের বা মুশরেক হওয়ায় দুনিয়ায় কোন জাতির উপর খোদায়ী আযাব অবতীর্ণ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের কার্য-কলাপ ও চাল-চলন দ্বারা পৃথিবীতে ফেৎনা-ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি না করে। পূর্ববর্তী যতগুলি জাতি ধ্বংস হয়েছে তাদের বিশেষ বিশেষ অপকর্মই তজ্জন্য দায়ী। হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি তাঁকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট-ক্লেশ দিয়েছিল, হযরত শোয়াইব (আঃ)-এর দেশবাসী ওজনে-পরিমাপে হের-ফের করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, হযরত লূত (আঃ)-এর কওম জঘন্য যৌন অপকর্মে অভ্যস্ত হয়েছিল, হযরত মূসা ও ঈসা (সাঃ)-এর কওমের লোকেরা নিজেদের নবীগণের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেছিল। তাদের এ সব কার্য-কলাপই দুনিয়ায় তাদের উপর আযাব নযিল হওয়ার মূল কারণ। শুধু কুফরী বা শেরেকীর কারণে দুনিয়ায় আযাব আপতিত হয় না। কেননা, তার শাস্তিতে তো দোযখের আগুনে চিরকাল ভোগ করবেই। এজন্যই কোন কোন আলেমের অভিমত হচ্ছে যে, কুফরী ও শেরেকীতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে রাজত্ব-বাদশাহী করা যেতে পারে, কিন্তু অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত হওয়ার পর তা বজায় থাকতে পারে না।